বাংলা শব্দতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

বাংলা শব্দতত্ত্ব

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) ... অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

মূল্য—১৲

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে

ভূমিকা

এই গ্রন্থে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যথার্থ বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়। প্রাচীন প্রাকৃতের মতোই বাংলা প্রাকৃতের বৈচিত্র্য আছে। চাটগাঁ থেকে আরম্ভ ক'রে বীরভূম পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতের বিভিন্নতা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কোন্ প্রাকৃতের রূপ বাংলা-সাহিত্যে সাধারণত স্বীকৃত হবে সেই প্রশ্ন ১৩২৩ শালে প্রকাশিত প্রবন্ধে "সবুজপত্রে" আলোচিত হয়। বস্তুত এই তর্ক সূচনা হবার বহু পূর্ব্বেই সহজে তা স্বীকৃত হয়ে গেছে। বাংলা নাটকে পাত্রদের মুখে যে বাংলায় বাক্যালাপ বিনা বিতর্কে প্রচলিত হয়েছে তা পূর্ব্ব উত্তর অথবা পশ্চিম প্রান্তের বাংলা নয়। এই গ্রন্থের আরম্ভে প্রয়োজন অনুভব ক'রে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করা হোলো।

ভাষার কথা

পদ্মায় যখন পুল হয় নাই তখন এপারে ছিল চওড়া রেলপথ, ওপারে ছিল সরু। মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেলপথের এই দ্বিধা আমাদের সহিয়াছিল। এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবস্থার কার্পণ্যে যখন অর্দ্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না।

ও তো গেল মানুষ এবং মাল চলাচলের পথ, কিন্তু ভাব চলাচলের

পথ হইল ভাষা। কিছুকাল হইতে বাংলা দেশে এই ভাষায় দুই বহরের পথ চলিত আছে। একটা মুখের বুলির পথ, আর একটা পুঁথির বুলির পথ। দুই একজন সাহসিক বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, পথ এক মাপের হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অথচ ইহাতে বিস্তর লোকের অমত। এমন কি তাঁরা এতই বিচলিত যে, সাধু ভাষার পক্ষে তাঁরা যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে বাংলা-ভাষায় আর যা-ই হোক্, সাধুতার চর্চ্চা হইতেছে না।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ দিই নাই তবু আমার নাম উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার যে কী মত তাহা আমি ছাড়া আমার দেশের পনেরো আনা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন; এবং যাঁর যা মনে আছে বলিতে কসুর করেন নাই। ভাবিয়াছিলাম চারিদিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু বুঝিয়াছি সে আমার জীবিত কালের মধ্যে ঘটিবার আশা নাই। অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটোবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। বোধ করি সেই জন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না। যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্যভাষার পথটা যে এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রাকৃত বাংলা-ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার যেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাতে আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশি। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়া গাড়ির গরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহঙ্কারের যোগ আছে। যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্যথা হইতে পারে এমন কথা শুনিলে রাগ হয়। মতের অনৈক্যে রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহঙ্কার। মনে আছে বহুকাল পূর্ব্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালীর শিক্ষা বাংলা-ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালী আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয় তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তার অহঙ্কার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথাটা এইখানেই কবুল করি। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইলাম; এ লইয়া এপক্ষে বা ওপক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই। কিন্তু "সবুজপত্র"-সম্পাদকের বুদ্ধি নাকি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকায় থাকিয়া অনেক দিন হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাষাসম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভালো লাগে নাই। এমন কি, রাগ করিয়াছিলাম। নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহঙ্কার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে, কিন্তু অহঙ্কার যে পুরাতন সংস্কারের পক্ষেই প্রবল এ কথা বুঝিতে সময় লাগে। অতএব, প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পংক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে সব যুক্তি শোনা যাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আবৃত্তি করিয়াছি।

এক জায়গায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত। পদ্য রচনায় আমি প্রচলিত আইন কানুন কোনোদিন মানি নাই। জানিতাম কবিতায় ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে, কিন্তু সে বাঁধন নূপুরের মতো,তাহা বেড়ির মতো নয়। এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোদিন ভয় পাই নাই।

"ক্ষণিকা"য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা-ভাষা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।

বলা বাহুল্য "ক্ষণিকা"য় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন, কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে

নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের, সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে।

এইখানে বলা আবশ্যক চিঠিপত্রে আমি চিরদিন কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছি। আমার সতেরো বছর বয়সে লিখিত "য়ুরোপ যাত্রীর পত্রে" এই ভাষা প্রয়োগের প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বক্তৃতা সভায় আমি চিরদিন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করি, "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে তাহার উদাহরণ মিলিবে।

যা-ই হোক্ এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই—বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা-ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্ত্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত-ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গন্থ-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত-ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্ম কিছু সামান্ম পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ এক রকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্মই বাংলা গন্থের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়িত না। কিন্তু এই গন্থ যতই বাঙালীর ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরি-বর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্য্যন্ত বাংলা গন্থ, সংস্কৃত-ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্ম যুঝিয়া আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যাবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনফার সঙ্গে সঙ্গে মূল ধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যাবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গন্থের ব্যাবসা মূলধন লইয়া সুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার সুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্মই তার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটিতে এত বাধা কেন, তার কারণ আছে। যে গদ্যে বাঙালী কথাবার্ত্তা কয় সে গদ্য বাঙালীর মনোবিকাশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণত বাঙালী যে-বিষয় ও যে-ভাব লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গদ্য সেই

মাপেরই। জলের পরিমাণ যতটা, নদীপথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অনুসারেই হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগীরথও আগে লম্বা চওড়া পথ কাটিয়া তার পরে গঙ্গাকে নামাইয়া আনেন নাই।

বাঙালী যে ইতিপূর্ব্বে কেবলি চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তার চেয়ে বড়ো কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যাবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা-ভাষায় মনন করা বা মত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চ চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা-ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা-ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

এমন সময় যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না কিন্তু সব চেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত

বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। "প্রার্থনা" সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ "চাওয়া"। "প্রার্থিত" "প্রার্থনীয়" শব্দের ভাবটা যদি ঐ খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক "চায়িত" ও "চাওনীয়" বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্য পদকে বাংলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় এ পর্য্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার তদ্ধিত প্রত্যয় পর্য্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সাম্‌লাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্ল-গিরি করিতে হয়। তার পর হইতে এ তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তুভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিগাড়ি হয়, আবার অপর পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে তখন তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ বিভাগে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন।

কিন্তু মুস্কিলের বিষয় এই যে, যে-ভাষায় মল্লবিদ্যার সাহায্য

ছাড়া এক পা চলিবার জো নেই সেখানে সাধারণের পক্ষে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশি। পথটাই যেখানে দুর্গম সেখানে হয় মানুষের চলিবার তাগিদ থাকে না, নয় চলিতে হইলে পথ অপথ দুটোকেই সুবিধা অনুসারে আশ্রয় করিতে হয়। ঘাটে মাল নামাইতে হইলে যে দেশে মাশুলের দায়ে দেউলে হওয়ার কথা সে দেশে আঘাটায় মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং বোপদেব চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাটী আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের ব্যাবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।

জাপানীদের ঠিক এই বিপদ। চীনা ভাষার শাসন জাপানি ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ প্রাকৃত জাপানি প্রাকৃত বাংলার মতো; নূতন প্রয়োজনের ফরমাস জোগাইবার শক্তি তার নাই। সে শক্তি প্রাচীন চীনা ভাষার আছে। এই চীনা ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানি ভাষাকে চলিতে হয়। কাউণ্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিষম পালোয়ানীর দায়ে জাপানি-সাহিত্যের বড়োই ক্ষতি করিতেছে। কারণ এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটাই একটা কুস্তিগিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে মাটি কড়া, সেখানে ফসলের দুর্দ্দিন। যেখানে শক্তির মিতব্যয়িতা, অসম্ভব শক্তির সদ্ব্যয়ও

সেখানে অসম্ভব। যদি পণ্ডিত মশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা, তবে যাঁদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।

ইহার পূর্ব্বেও "আলালের ঘরে দুলাল" প্রভৃতির মতো বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই। এখনি যে আসিল এ কথা বলিবার হেতু কী? হেতু আছে। তাহা বলিবার চেষ্টা করি।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যাবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য ঘটে নাই। রামমোহন রায় হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই, নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদেব ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা ঘরে ঘরে মুখে মুখে যে সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পঁচিশ বছর পূর্ব্বে করিলে দুর্ঘটনা ঘটিত। এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া ব্রিজ্ বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্ব্বে সাধু-ভাষায় যাদের জল-চল ছিল না। সেই জন্যই পুঁথির ভাষায় ও মুখের ভাষায় সমান বহরের রেল পাতিবার যে-প্রস্তাব উঠিয়াছে,

অভ্যাসের আরামে ও অহঙ্কারে ঘা লাগিলেও সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেই সঙ্গে একথাও মানা চাই যে তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসঙ্গতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু-আধটু ফাঁক পায় সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে, তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্যভাষা সংস্কৃতের গরাদের ভিতর দিয়া, চল্‌তি ভাষার দিকে মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইতে সুরু করিয়াছিল। তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিন্দা সহিতে হয় নাই। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে। তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটু কথার হাওয়াটাই বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া। ইহা কুঞ্জবনকে নাড়া দিয়া

তাড়া দিয়া অস্থির করিয়া দেয় কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্ত্তন পালার প্রথম খোলের চাঁটি।

পুঁথির বাংলার যে অংশটা লইয়া বিশেষভাবে তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। "হইবে"র জায়গায় "হবে", "হইতেছে"র জায়গায় "হচ্চে" ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনারা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্ব্বতাকে তারা মানের খর্ব্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে,—আপদ গেছে। এক সময়ে ছাপার বহিতে "হয়েন" লেখা চলিত, এখন "হন" লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। "হইবা" "করিবা"র আকার গেল, "হইবেক" "করিবেক"-এর ক খসিল, "করহ" "চলহ"র হ কোথায়? এখন "নহে"র জায়গায় "নয়" লিখিলে বড়ো কেহ লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা "কেহ" লিখি, তেমনি এক সময়ে ছাপার বইয়েও "তিনি"র বদলে "তেঁহ" লিখিত। এক সময়ে "আমারদিগের" শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন "আমাদের" লিখিতে কারো হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখিতাম "সেহ" এখন সেখানে লিখি "সেও", অথচ পণ্ডিতের ভয়ে "কেহ"কে "কেও" অথবা "কেউ" লিখিতে পারি না। ভবিষ্যৎবাচক "করিহ" শব্দটাকে "করিয়ো" লিখিতে সঙ্কোচ করি না, কিন্তু তার বেশি আর একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না।

এই তো আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত

যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন·নাই। বাংলা গদ্য-পুঁথিতে যখন তাঁরা "যাইয়াছি" "যাইল" কথা চালাইয়া দিলেন তখন তাঁরা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করেন নাই যে, এই ক্রিয়া-পদটি একেবারে বাংলাই নয়। যা ধাতু বাংলায় কেবলমাত্র বর্ত্তমান কালেই চলে, যথা, যাই, যাও, যায়। আর, "যাইতে" শব্দের যোগে যে সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় তাহাতেও চলে যেমন, "যাচ্চি" "যাচ্ছিল" ইত্যাদি। কিন্তু "যেল" যেয়েছি" "যেয়েছিলুম" পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না। এ স্থলে আমরা বলি "গেল" "গিয়েছি" "গিয়েছিলুম"। তার পরে পণ্ডিতেরা "এবং" বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দ ব্যবহারের যে মিল আছে তাও তো দেখি না। বরঞ্চ সংস্কৃত "অপর" শব্দের আত্মজ যে "আর" শব্দ সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসঙ্গত। বাংলায় "ও" বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপি শব্দের বাংলা রূপ। ইহা ইংরেজি "and" শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে—কিন্তু কখনও বলি না "আমি ও তুমি যাব।" সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্বসমাস ব্যবহার করি। আমরা বলি "বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো।" যদি ভিন্ন শ্রেণীয় পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি "বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো।" এর মধ্যে "এবং"

কিম্বা “ও” কোথাও স্থান পায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা-ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। আমি এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মৎলব এই যে, পণ্ডিত মশায় যদি সংস্কৃতরীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলারীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃতরীতিকে লঙ্ঘন করিতে সঙ্কোচ করি? “মনোসাধে” আমাদের লজ্জা কিসের? “সাবধানী” বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং “আশ্চর্য্য হইলাম” বলিলে পণ্ডিত মশায় “আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন” কী কারণে?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই—যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলি সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্য দশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইনকর্ত্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশি আর তার নড়িবার হুকুম নাই।

“সবুজপত্র”-সম্পাদক বলেন বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালা বদল করিবার জন্য। গুরুজন

ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলিন্যের নির্ম্মম শাসন ভেদ করিবেন এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন—কারণ কথা আছে শুভস্য শীঘ্রং।

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলায় চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে-যেমন খুসি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুসিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুসিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে যাহাতে "গেনু" "করনু" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং "ভেয়ের বে" (ভাইয়ের বিয়ে) "চেলের দাম" (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বলো—তবে এই ভাষাকে কে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ

শক্তি হইতেই বাংলার এই সর্ব্বজনীন ভাষা বাহির করিবেন। দান্তে নিজের প্রতিভাবলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ চলিতেছে। বঙ্কিমের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত বাংলার গদ্য-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা। সকল ভদ্র ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলণ্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণ-ভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন? আর এ কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? যখন বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়াছিল তখন আমাদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা রাজনৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব্ব পশ্চিমে একটা চিত্তের ভাগ হইবে।

সমস্ত বাংলা দেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলা দেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাসে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকযন্ত্রে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকযন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না, তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতই দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ঈর্ষা করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকযন্ত্র বহন করুক তবে আমাদের হাত পা বুক পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকযন্ত্র চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে-ছাঁদে ক্রমশ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে-ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অন্য দেশে যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি এখানেও একটি বিশেষ ভাষা

বাংলা দেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোক-ভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলা দেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অবাস্তব নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে তর্ক আছে সেটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প অসংযম তাদেরই বেশি। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব-

কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্ত্তমানে এই চল্‌তি ভাষার লেখা, পুঁথির ভাষার লেখার চেয়ে অনেক শক্ত। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই, এই জন্য ভদ্রতা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই অন্তত প্রথাগত ভদ্রতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া ওঠে। "সবুজপত্র"-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলা দেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা সুরু করিয়া দেয় তবে সর্ব্বপ্রথমে তাঁকেই কানে হাত দিয়া দেশ ছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অতএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই দুর্য্যোগের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে যারা বহন করিয়া আনে তারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তারাও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু যতদিনে তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে?

একথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যতার

ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এই জন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবন স্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে একদিকে সাধারণ, আর একদিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তার বিলাসিতা তার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যাদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে আবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা ল্যাটিন এবং রাজভাষা ফরাসীর একটা কৌলিন্য খিচুড়ি ছিল, তার পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। কিন্তু তার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকিয়াছে, আবার তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পথে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে

পাই। বার্ণার্ড্‌শ, ওয়েল্‌স্‌, বেনেট্‌, চেস্‌টরটন্‌, বেলক প্রভৃতি আধুনিক লেখকগুলি হাল্‌কা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে-ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য "সবুজপত্র"-সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট—এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে "পয়লা সামাল্‌না মুস্কিল হয়।" স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচী

বাংলা উচ্চারণ।

ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করিতে গিয়াই বাঙালীর ছেলের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। প্রথমত ইংরাজি অক্ষরের নাম এক রকম, তাহার কাজ আর-এক রকম। অক্ষর দুটি যখন আলাদা হইয়া থাকে তখন তাহারা এ, বি, কিন্তু একত্র হইলেই তাহারা অ্যাব্ হইয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। এদিকে uকে মুখে বলিব ইউ, কিন্তু up-এর মুখে যখন থাকেন তখন তিনি কোনো পুরুষে ইউ নন্। "ও পিসি এদিকে এসো"—এই শব্দগুলো ইংরাজিতে লিখিতে হইলে উচিতমতো লেখা উচিত—O pc adk so। পিসি যদি বলেন "এসেছি"—তবে লেখো She—আর পিসি বলেন "এইচি" তবে আরও সংক্ষেপ he। কিন্তু কোনো ইংরাজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া উঠে। আমাদের কখগঘ-র কোনো বালাই নাই—তাহাদের কথার নড়চড় হয় না।

এই তো গেল প্রথম নম্বর। তার পরে আবার এক অক্ষরের পাঁচ রকম উচ্চারণ। অনেক কষ্টে যখন বি, এ=বে, সি, এ=কে মুখস্থ হইয়াছে—তখন শুনা গেল বি, এ, বি=ব্যাব, সি, এ, বি=ক্যাব্। তাও যখন মুখস্থ হইল তখন শুনি, বি, এ, আর=বার, সি, এ, আর=কার। তাও যদি বা আয়ত্ত হইল তখন শুনি, বি, এ, ডব্‌ল্ এল=বল; সি, এ, ডব্‌ল্ এল=কল্। এই অকূল বানান পাথারের মধ্যে গুরু মহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালনা করেন তাঁহার কম্পাসই বা কোথায়, তাঁহার ধ্রুব-তারাই বা কোথায়!

আবার এক এক জায়গায় অক্ষর আছে অথচ তাহার উচ্চারণ নাই—একটা কেন এমন পাঁচটা অক্ষর সারি সারি বেকার দাঁড়াইয়া আছে—বাঙালীর ছেলের মাথার পীড়া ও অম্লরোগ জন্মাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোনো সাধু উদ্দেশ্যই দেখা যায় না। মাষ্টার মশায় psalm শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি! পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিরাজ করে—তেমনি ইংরাজি শব্দের উদর পরিপূর্ণ করিয়া অনেকগুলি অক্ষর কেবল রোগের বীজ স্বরূপে থাকে মাত্র। বাংলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটি মাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ সঙ্গীন্ ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়—"গবর্ণমেণ্ট" শব্দের মূর্দ্ধণ্য ণ!

ওটা বিদেশের আমদানী নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।

ইংরাজের কামান আছে বন্দুক আছে কিন্তু ছাব্বিশটা অক্ষরই কি কম! ইহারা আমাদের ছেলেদের পাকযন্ত্রের মধ্যে গিয়া আক্রমণ করিতেছে। ইংরাজের প্রজা বশীভূত করিবার এমন উপায় অতি অল্পই আছে। বাল্যকাল হইতেই একে একে আমাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়; আমাদের বাহুর বল, চোখের দৃষ্টি, উদরের পরিপাকশক্তি বিদায় গ্রহণ করে, তার পরে ম্যালেরিয়া-কম্পিত-হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লওয়াই বাহুল্য। আইন ইংরাজ রাজ্যের সর্ব্বত্র আছে (রক্ষা হউক্ আর নাই হউক্) কিন্তু ইংরাজের ফাষ্ট্ বুকে নাই। যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত—কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরাজী ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না। ঘুমপাড়ানী গান নিম্নলিখিত মতে বদল করিলে সঙ্গত হয়—ইহাতে আজকালকার বাঙালীর ছেলেও ঘুমাইবে, বর্গির ছেলেও ঘুমাইবে :—

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
ফাষ্টবুক্ এল দেশে—
বানান্ ভুলে মাথা খেয়েছে
একজামিন্ দেবো কিসে!

পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ,

শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে সয়ের হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্ব্বে পণ্ডিত মশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে "দেখো বাপু,'সুশীতল সমীরণ' লিখ্‌তে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিও 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" এ ছাড়া দুটো বয়ের মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ,৯ ঙ, ঞ গুলো কেবল সং সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘ হ্রস্বস্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্ না কেন আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংলণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরাজ বন্ধুকে বাংলা পড়াই-বার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গ-ভূমির সংক্ষিপ্তসার।

"হরি" শব্দে আমারা "হ" যেরূপ উচ্চারণ করি "হর" শব্দে "হ" সেরূপ উচ্চারণ করি না। "দেখা" শব্দের একার একরূপ, এবং দেখি শব্দের একার আর একরূপ। "পবন" শব্দে "প" অকারান্ত "ব" ওকারান্ত, "ন" হসন্ত শব্দ। "শ্বাস" শব্দের "শ্ব"র উচ্চারণ বিশুদ্ধ "শ"য়ের মতো, কিন্তু বিশ্বাস" শব্দের "শ্ব"য়ের

উচ্চারণ "শ্শয়ের ন্যায়। "ব্যয়" লিখি কিন্তু পড়ি "ব্যায়"। অথচ "অব্যয়" শব্দে "ব্য"য়ের উচ্চারণ "ব্ব"য়ের মতো। আমরা লিখি "গর্দ্দভ," পড়ি "গর্দ্ধোব্"। লিখি "সহ্য" পড়ি "সোজ্ঝো"। এমন কত লিখিব।

আমরা বলি আমাদের তিনটে "স"য়ের উচ্চারণের কোনো তফাৎ নাই ; বাংলায় সকল "স"ই তালব্য "শ"য়ের ন্যায় উচ্চারিত হয়—কিন্তু আমাদের যুক্ত অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখো "কষ্ট" শব্দ এবং "ব্যস্ত" শব্দের দুই শয়ের উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। "আস্তে হবে" এবং "আশ্চর্য্য" এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শয়ের প্রভেদ রাখা হইয়াছে। "জ"য়ের উচ্চারণ কোথাও বা ইংরাজি z এর মতো হয়—যেমন "লুচি ভাজ্তে হবে" এস্থলে "ভাজ্তে শব্দের "জ" ইংরাজি "z"-এর মতো।

সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্তঃস্থ বয়ের আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু "জিহ্বা" অথবা "আহ্বান" শব্দে অন্তঃস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

আমরা লিখি "তাঁহারা" কিন্তু উচ্চারণ করি "তাহাঁরা" অথবা "তাঁহাঁরা"। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বাংলা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা। আমার কাছে তখন খানদুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি

উদাহরণ সঞ্চিত হইল তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পূরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, একদিন সকাল বেলায় ধূলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে চাহিয়া দেখি—গোটাদশেক হল্‌দে রং-করা মস্ত খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সর মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজ পত্র কোথায়? কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড় চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণ-টুকু পর্য্যন্ত কিছুরই ক্রটি দেখিলাম না, কেবল আমার কাগজ-গুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণের ঘরে এমনি একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

কিছু কিছু মনে আছে তাহাই লিখিতেছি। অ কিম্বা অকারান্ত

বর্ণ, উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিম্বা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমন—

অতি, কলু, ঘড়ি, কল্য, মরু, দক্ষ ইত্যাদি। এরূপ স্থানে "অ" যে "ও" হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব "ও" বলিলেও হয়।

দেখা গিয়াছে অ কেবল স্থানবিশেষেই ও হইয়া যায়, সুতরাং ইহার একটা নিয়ম পাওয়া যায়।

১ম নিয়ম। ই, (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ, (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিম্বা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের উচ্চারণ ও হইবে। যথা অগ্নি, অগ্রিম, কপি, তরু, অঙ্গুলি, অধুনা হনু ইত্যাদি।

২য়। য ফলাবিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে "অ" "ও" হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ য ফলা "ই" এবং অয়ের যোগ মাত্র। উদাহরণ—গণ্য, দন্ত্য, লভ্য ইত্যাদি। "দন্ত" এবং "দন্ত্য ন" এই দুই শব্দের উচ্চারণের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া দেখো।

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "অ" "ও" হইয়া যায়। যথা—অক্ষর, কক্ষ, লক্ষ, পক্ষ ইত্যাদি। ক্ষ শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা এই "ক্ষ"র সঙ্গে য ফলা যোগ করিয়া উচ্চারণ করেন, এমন কি "ক্ষ"র পূর্ব্বেও ঈষৎ ইকারের আভাস দেন। কলিকাতা অঞ্চলে "লক্ষ টাকা" বলে, তাঁহারা বলেন "লৈক্ষ্য টাকা।"

৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ “ও” হইয়া যায়। যেমন, হ'লে, ক'রলে, প'ল, ম'ল, ইত্যাদি অর্থাৎ যদি কোনো স্থলে অ-য়ের পরবর্ত্তী ই অপভ্রংশে লোপ হইয়া থাকে তথাপিও পূর্ব্ববর্ত্তী অয়ের উচ্চারণ “ও” হইবে। “হইলে”-র অপভ্রংশ “হ'লে”; “করিলে”-র অপভ্রংশ “ক'রলে”; “পড়িল” “প'ল; “মরিল” “ম'ল”। “করিয়া”র অপভ্রংশ “ক'রে,” এই জন্য “ক”য়ে ওকার যোগ হয়—কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া “করে” অবিকৃত থাকে। কারণ “করে” শব্দের মধ্যে “ই” নাই এবং ছিল না।

৫ম। ঋফলা বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্ব্বের অকার “ও” হয়। যথা, কর্ত্তৃক, ভর্ত্তৃ, মসৃণ, যকৃত, বক্তৃতা ইত্যাদি। ইহার কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, বঙ্গভাষার ঋ ফলার উচ্চারণের সহিত ইকারের যোগ আছে।

৬ষ্ঠ। এবারে যে নিয়মের উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্দ্ধণ্য ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও হইয়া যায়। যথা, বন, ধন, জন, মন, মণ, পণ, ক্ষণ। ঘন শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন—ঘনো দুধ, কেহ বলেন ঘোনো দুধ। কেবল গণ এবং রণ শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশি অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না। যেমন কনক, গণক, সন্‌সন্, কন্‌কন্। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে সেখানেও এ নিয়ম খাটে না। যেমন, “কহেন” শব্দের অপভ্রংশ

"ক'ন," "হয়েন" শব্দের অপভ্রংশ "হ'ন" ইত্যাদি। যাহা হউক্ ষষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী "অ" "ও" হইয়াছে; অপভ্রংশে উকারের লোপ হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে। যথা—"হউন" "হ'ন"। "রহুন"—"র'ন।" "কহুন"—"ক'ন।" ইত্যাদি।

৮ম। রফলা বিশিষ্ট বর্ণের সহিত অ লিপ্ত থাকিলে তাহা ও হইয়া যায়। যথা,—শ্রবণ, ভ্রম, ভ্রমণ, ব্রজ, গ্রহ, ত্রস্ত, প্রমাণ, প্রতাপ। ইত্যাদি। কিন্তু য় পরে থাকিলে "অ"য়ের বিকার হয় না। যথা ক্রয়, ত্রয়, শ্রয়।

দুয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিম্বা উয়ের পূর্ব্বে "অ"য়ের উচ্চারণ ও হইয়া যায়। এমন কি ইকার উকার অপভ্রংশে লোপ হইলেও এ নিয়ম খাটে। এমন কি, যফলা ও ঋফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্ব্বেও অ"য়ের" বিকার হয়। ইকারের পক্ষে যেমন য ফলা, উকারের পক্ষে তেমনি ব ফলা—উয়ে অয়ে মিলিয়া ব ফলা হয়; অতএব আমাদের নিয়মানুসারে ব ফলার পূর্ব্বেও অকারের বিকার হওয়া উচিত। কিন্তু ব ফলার উদাহরণ অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া একথা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দুই তিনটি মনে আসিতেছে তাহাতে আমাদের কথা খাটে। যথা—অন্বেষণ, ধন্বন্তরী মন্বন্তর।

এইখানে গুটিকতক ব্যতিক্রমের কথা বলা আবশ্যক। ই, উ,

য ফলা, ঋ ফলা, ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক "অ"য়ের বিকার হয় না। যথা—অকিঞ্চন, অকুতোভয়, অখ্যাতি, অনৃত, অক্ষয়,

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিয়ম মানে না অর্থাৎ ই উ যফলা ঋফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্ত্তী অ ও হইয়া যায়। মন্দ, মন্ত্র, মন্ত্রণা, নখ, মঙ্গল, ব্রহ্ম।

আমি এই প্রবন্ধে কেবল আদ্যক্ষরবর্ত্তী অকার উচ্চারণের নিয়ম লিখিলাম। মধ্যাক্ষর বা শেষাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর পাই নাই। মধ্যাক্ষরে যে প্রথম অক্ষরের নিয়ম খাটে না, তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। "বল" শব্দে "ব"য়ের সহিত সংযুক্ত অকারের কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু "কেবল" শব্দের "ব"য়ে হ্রস্ব ওকার লাগে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের নিয়মও সময়াভাবে বাহির করিতে পারি নাই। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেওয়াই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কোনো অধ্যবসায়ী পাঠক রীতিমতো অন্বেষণ করিয়া এই সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তবে আমাদের বাংলা ব্যাকরণের একটি অভাব দূর হইয়া যায়।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক, যে, প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।

বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

১২৯৮।

টা টো টে

একটা, দুটো, তিনটে। টা, টো, টে। একই বিভক্তির এরূপ তিন প্রকার ভেদ কেন হয় এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমাদের বাংলা শব্দে যে সকল উচ্চারণ-বৈষম্য আছে মনোনিবেশ করিলে তাহার একটা-না-একটা নিয়ম পাওয়া যায় এ কথা আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি বাংলায় আদ্যক্ষরবর্ত্তী অ স্বরবর্ণ কখনো কখনো বিকৃত হইয়া ও হইয়া যায় —যেমন কলু (কোলু), কলি (কোলি), ইত্যাদি—স্বরবর্ণ এ বিকৃত হইয়া অ্যা হইয়া যায়—যেমন খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা), ইত্যাদি—কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন গুটিকতক নিয়মের অনুবর্ত্তী।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ই এবং এ স্বরবর্ণ বাংলার বহুসংখ্যক উচ্চারণ-বিকারের মূলীভূত কারণ; উপস্থিত প্রসঙ্গেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ। সে অথবা এ শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন সেটা, এটা। কিন্তু সেই অথবা এই শব্দের পরে টা বিভক্তির বিকার জন্মে। যেমন এইটে, সেইটে।

অতএব দেখা গেল ইকারের পর "টা" টে হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র টা বিভক্তির মধ্যে এই নিয়মকে সীমাবদ্ধ করিলে সঙ্গত হয় না। ইকারের পরবর্ত্তী আকারমাত্রের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

হইয়া—হয়ে	হিসাব—হিসেব
লইয়া—লয়ে	মাহিনা—মাইনে
পিঠা—পিঠে	ভিক্ষা—ভিক্ষে
চিঁড়া - চিঁড়ে	শিক্ষা—শিক্ষে
শিকা—শিকে	নিন্দা—নিন্দে
বিলাত—বিলেত	বিনা—বিনে

এমন কি, যেখানে অপভ্রংশের মূল শব্দের ইকার লুপ্ত হইয়া যায় সেখানেও এ নিয়ম খাটে। যেমন—

করিয়া—ক'রে
মরিচা—মর্চ্চে
সরিষা—সর্ষে

আ এবং ই মিলিত যুক্তস্বর হইয়া ঐ হয়। এজন্য ঐ স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হইয়া যায়। যেমন—

কৈলাস—কৈলেস
তৈয়ার—তোয়ের

কেবল ইহাই নহে। য-ফলার সহিত সংযুক্ত আকারও একারে পরিণত হয়। কারণ, য-ফলা ই এবং অ-য়ের যুক্তস্বর। যথা—

অভ্যাস—অভ্যেস
কন্যা—কন্যে
বর্ন্যা—বন্যে
হত্যা—হত্যে

আমরা অ স্বরবর্ণের সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছিলাম ক্ষর পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও হইয়া যায়। যেমন, লক্ষ (লোক্ষ), পক্ষ (পোক্ষ), ইত্যাদি। যে কারণবশতঃ ক্ষ-র পূর্ব্ববর্ত্তী অ ওকারে পরিণত হয় সেই কারণেই ক্ষ-সংযুক্ত আকার এ হইয়া যায়। যথা, রক্ষা—রক্ষে। বাংলায় ক্ষা-অন্ত শব্দের উদাহরণ অধিক না থাকাতে এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

য-ফলা এবং ক্ষ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি। য-ফলা ও ক্ষ-সংযুক্ত আকার একারে পরিণত হয় বটে কিন্তু আদ্যক্ষরে এ নিয়ম খাটে না; যেমন ত্যাগ, ন্যায়, ক্ষার ক্ষালন ইত্যাদি।

বাংলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ছিল করিলা, খাইলা, করিতা, খাইতা, করিবা, খাইবা। এখন হইয়াছে করিলে, খাইলে, করিতে, খাইতে, করিবে, খাইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের প্রভাবেই যে আ স্বরবর্ণের ক্রমশ এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে ই থাকিলে যেমন পরবর্ত্তী আ এ হইয়া যায় তেমনি পূর্ব্বে উ থাকিলে পরবর্ত্তী আ ও হইয়া যায় এইরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে। যথা—

ফুটা—ফুটো
মুঠা—মুঠো
কুলা—কুলো
চুলা—চুলো

কুয়া—কুয়ো

চুমা—চুমো

ঔকারের পরেও এ নিয়ম খাটে। কারণ, ঔ অ এবং উ-মিশ্রিত যুক্তস্বর। যথা—

নৌকা —নৌকো

কৌটা—কৌটো

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার দুই একটা উচ্চারণবিকার এমনি দৃঢ়মূল হইয়া গেছে যে, যেখানেই হৌক তাহার অন্যথা দেখা যায় না। যেমন ইকার এবং উকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কে আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই ও উচ্চারণ করি। সাধুভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে-সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় যদিও মুঠাকে মুঠো বলি তথাপি গ্রন্থে পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি—চলিত ভাষায় বলি নিন্দে, সাধু ভাষায় বলি নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রেণীভেদ আছে। পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

১২৯৯।

স্বরবর্ণ 'অ'

বাংলা শব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহারই অনুবৃত্তিক্রমে আরো কিছু বলিবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জ্জনা করিতে হইবে।

বাংলায় প্রধানত 'ই' এবং 'উ' এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে গত শব্দের গ-য়ে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-য়ে ওকার সংযোগ হইয়াছে। কণ এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখো।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্ত্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্ত্তী বর্ণে য-ফলা থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্ত্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলত য-ফলা, ইকার

এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্ব্ব নিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। *

ঋ-ফলাবিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্ব্বের অকার 'ও' হয়। এ সম্বন্ধে কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃ, ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনা স্থলে আনা যায়। কিন্তু বাংলায় ঋ-ফলা উচ্চারণে ইকার যোগ করা হয়, অতএব ইহাকেও পূর্ব্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না। ‡

অপভ্রংশে পরবর্ত্তী 'ই' অথবা 'উ' লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে। যেমন 'হইল' শব্দের অপভ্রংশে 'হ'ল', 'হউন' শব্দের অপভ্রংশে 'হন' (কিন্তু 'হয়েন' শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ 'হন' উচ্চারণ হয়)। 'থলিয়া' শব্দের অপভ্রংশে 'থলে', 'টকুয়া' শব্দের অপভ্রংশে ট'কো (অম্ল)।

'ক্ষ'র পূর্ব্বেও 'অ' 'ও' হইয়া যায়। যেমন কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ। 'ক্ষ' শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার ঘেঁষা ছিল তাই

---

* য-ফলা যেমন 'ই' এবং 'অ'র সংযোগ, ব-ফলা তেমনি 'উ' এবং 'অ'র সংযোগ, অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্ব্বনিয়ম খাটে। কিন্তু ব-ফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে দুয়েকটি মনে পড়িতেছে তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যথা অন্বেষণ, ধন্বন্তরী, মন্বন্তরী। কজ্জ্বল, সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং ব-ফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

‡ মহারাষ্ট্রীয়েরা 'ঋ' উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতিকে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন প্রক্রুতি।

এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এখনো পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা 'ক্ষ'র সঙ্গে য-ফলা যোগ করেন; এবং তাঁহাদের দেশের য-ফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণে ঐ-কার যোগ করিয়া দেন। যেমন, তাঁহারা 'লক্ষটাকাকে' বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা'।

যাহা হৌক্ মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই একটা ব্যতিক্রম আছে পূর্ব্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে 'ও' স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত আমরা সংস্কৃত 'অ'র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের 'অ', সংস্কৃত 'অ' এবং 'ও'র মধ্যবর্ত্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের 'অ' সম্পূর্ণ 'ও' হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে। যেমন 'অ' এবং 'উ'র মধ্য পথে 'ও'; 'অ' এবং 'ই'র সেতুস্বরূপ 'এ'; যখন এক পক্ষে 'ই' অথবা 'এ' এবং অপর পক্ষে 'আ' তখন 'অ্যা' তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভঞ্জন করে। বোধ হয় ভালো করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে বাঙালীরা উচ্চারণকালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

১২৯৯।

স্বরবর্ণ 'এ'।

বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপ ব্যবহৃত হইলে তাহার দুইপ্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর একটি অ্যা। 'এক' এবং 'একুশ', শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাংলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, কেবল এ সম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা যায়।—পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একারের কখনই বিকৃতি হয় না। 'জ্যেঠা' এবং জ্যেঠী' 'বেটা' এবং 'বেটী' 'একা' এবং 'একটু' তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে—অনেকস্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে। যথা 'তেলা' (তৈলাক্ত) এবং 'বেলা' (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক্, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী একারের কিরূপ অবস্থা হয়।

অধিকাংশ স্থলেই কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। যথা, কেশ বেশ পেট হেঁট বেল তেল শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য 'ন'য়ের পূর্ব্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা, ফেন (ভাতের), সেন (পদবী), কেন, যেন, হেন। মূর্দ্ধণ্য 'ণ'য়ের

পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ এই নিয়ম খাটে কিন্তু প্রচলিত বাংলায় তাহার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ 'দিন-'ক্ষণ'কে 'দিন খ্যাণ' বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি 'ন' অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে—বন,মন, ধন, জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উক্ত শব্দগুলিতে আদ্যক্ষরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট, মঠ, জল প্রভৃতি শব্দের প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস, পরবর্ত্তী 'চ' অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে—প্যাঁচ্। কিন্তু সেটা যে 'পেঁচ' শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে এমন অনুমান করিবার কোনো কারণ নাই। আর একটা বলা যায় ট্যাঁচ্। ট্যাঁচ্' করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্ব্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন চয়ের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ একার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এখানে বলা আবশ্যক আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

পূর্ব্বনিয়মের দুটো একটা ব্যতিক্রম আছে। কোনো পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন তো সুখী হইব। এদিকে 'ভেক' উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই, অথচ 'এক' শব্দ উচ্চারণে

'এ' স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর একটা ব্যতিক্রম 'লেজ' (লাঙ্গুল)। 'তেজ' শব্দের একার বিশুদ্ধ, 'লেজ' শব্দের একার বিকৃত।

বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দ-দ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে।

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। যথা, বড়ো-বড়ো, ছোটো-ছোটো, বাঁকা-বাঁকা. নেচে-নেচে, গেয়ে-গেয়ে, হেসে-হেসে, ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা প্যাট্‌প্যাট, টাঁটাঁ, খিট্‌খিট্‌ ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না। গাঁগাঁ, গোঁগোঁ চাঁচাঁ, চ্যাঁচ্যাঁ, টুক্‌টুক্‌ পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংস্রব পাওয়া যায়. যথা ঘেউঘেউ। এইরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি. যথা, ফ্যাস্‌ফ্যাস্‌, খ্যাঁক্‌-খ্যাঁক্‌, স্যাঁৎস্যাঁৎ, ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্ত্তে একার সংযুক্ত হয়; যথা, স্যাঁৎসেঁতে. ম্যাড-মেড়ে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁৎসেঁতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্ব্বে এ উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণসম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখো 'খেলা'

এবং 'গেলা' (গলাধঃকরণ) ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্ত্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম—সংস্কৃত মূল শব্দের ইকারের অপভ্রংশে বাংলার যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা—এই জন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল। যেমন মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা, ইত্যাদি।

ইহার ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচা) সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা), চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্ব্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, 'চ' অক্ষরের পূর্ব্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এই জন্যেই চয়ের পূর্ব্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক্, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্ব্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে—যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্য রূপ ধারণ-কালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকারূপে যে সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে 'এ' সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে। যথা—

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে।	বিশেষ্যরূপে।
কিনিয়া।	কেনা।

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে।	বিশেষ্য রূপে।
বেচিয়া।	ব্যাচা।
মিলিয়া।	মেলা।
ঠেলিয়া।	ঠ্যালা।
লিখিয়া।	লেখা।
দেখিয়া।	দ্যাখা।
হেলিয়া।	হ্যালা।
গিলিয়া।	গেলা।

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এই জন্য আমাদের অঞ্চলে আকারের পূর্ব্ববর্ত্তী একার প্রায়ই "অ্যা" নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

১২৯৯

ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই, অথচ সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া

পড়ে। প্রথমে তাহার একটি তালিকা দিতেছি; পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তালিকাটি যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি না।

আইঢাই, আঁকুবাঁকু, আনচান, আমতাআমতা॥

ইলিবিলি॥

উসখুস॥

কচ, কচাৎ, কচকচ, কচাকচ, কচর, কচর, কচমচ, কচর মচর, কট, কটাৎ, কটাস, কটকট, কটাকট, কটমট, কটর মটর, কড়কড়, কড়াৎ, কড়মড়, কড়র, মড়র, কনকন, কপ, কপাৎ, কপকপ, কপাকপ, করকর, কলকল, কসকস, কিচকিচ, কিচমিচ, কিচির, মিচির, কিটকিট, কিড়মিড়, কিরকির, কিলকিল, কিলবিল, কুচ, কুচকুচ, কুট, কুটকুট, কুটুর কুটুর, কুটুস, কুপ, কুপকুপ, কুপকাপ, কুলকুল, কুরকুর, কুঁইকুঁই, কেঁইমেই, কেঁউমেউ, ক্যাঁ, ক্যাঁক্যাঁ, কোঁকোঁ, কোঁৎকোঁৎ, ক্যাঁচ, ক্যাঁচক্যাচ, ক্যাঁচরক্যাঁচর, ক্যাঁটক্যাঁট। কচকচে, কটমটে, কড়কড়ে, কনকনে, করকরে, কিটকিটে (তেল কিটকিটে), কিরকিরে, কিলবিলে, কুচকুচে, কুটকুটে, ক্যাঁটকেঁটে।

খক, খকখক, খচখচ, খচাখচ, খচমচ, খট, খটখট, খটাখট, খটাস, খটাৎ, খটরখটর, খটমট, খটরমটর, খড়খড়, খড়মড়, খন, খনখন, খপ, খপাৎ, খপাস, খরখর, খলখল, খসখস, খাঁখাঁ, খিক, খিকখিক, খিটখিট, খিটমিট, খিটিমিটি, খিলখিল, খিসখিস, খুক, খুকখুক, খুটখুট, খুটুর খুটুর, খুটুসখুটুস, খুটখাট, খুঁৎখুঁৎ খুঁৎমুৎ, খুরখুর, খুসখুস, খেঁইখেঁই, খ্যাঁক, খ্যাঁকখ্যাঁক,

খ্যাঁচখ্যাঁচ, খ্যাঁচাখেঁচি, খ্যাঁৎখ্যাঁৎ, খ্যানখ্যান। খটখটে, খড়খড়ে, খরখরে, খসখসে, খিটখিটে, খিটমিটে, খুঁৎখুঁতে, খুঁৎমুতে, খুসখুসে (কাশি), খ্যানখেনে॥

গজগজ, গজরগজর, গট, গটগট, গড়গড়, গদগদ, গনগন, গপগপ, গবগব, গবাগব, গমগম, গরগর, গলগল, গসগস, গাঁগাঁ, গাঁইগুঁই, গাঁকগাঁক, গিজগিজ, গিসগিস, গুটগুট, গুড়গুড়, গুনগুন, গুপগুপ, গুবগাব, গুম, গুমগুম, গুরগুর, গোঁইগোঁই, গোঁগোঁ, গোঁৎগোঁৎ। গনগনে (আগুন), গমগমে, গুড়গুড়ে॥

ঘটঘট, ঘটর ঘটর, ঘড়ঘড়, ঘসঘস, ঘিনঘিন, ঘিসঘিস, ঘুটঘুট, ঘুটমুট, ঘুরঘুর, ঘুসঘুস, ঘেউঘেউ, ঘোঁৎঘোঁৎ, ঘেঁচ, ঘেঁচঘেঁচ, ঘ্যাঁচরঘ্যাঁচর, ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানরঘ্যানর। ঘুরঘুরে, ঘুসঘুসে (জর) ঘ্যানঘেনে॥

চকচক, চকরচকর (পশুর জলপান শব্দ), চকমক, চট, চটাস, চটচট, চটাচট, চটপট, চটাপট, চচ্চড়, চড়াৎ, চড়াস, চড়াচ্চড়, চন, চনচন, চপচপ, চপাচপ, চিঁচিঁ, চিকচিক, চিকমিক, চিটচিট, চিচ্চিড় চিড়িক, চিড়িকচিড়িক, চিড়বিড়, চিন, চিনচিন, চুকচুক, চুকুরচুকুর, চুচ্চুর, চেঁইভেঁই চেইমেই, চোঁ, চোঁচোঁ, চোঁভোঁ, চোচাঁ, চ্যাচ্যাঁ, চ্যাভ্যাঁ। চকচকে, চটচটে, চটপটে, চনচনে, চিকচিকে, চিটচিটে, চিনচিনে, চুকচুকে, চুচ্চুরে॥

ছটফট, ছপছপ, ছপাছপ, ছপাৎ, ছপাস, ছমছম, ছলছল, ছোঁ, ছোঁছোঁ, ছ্যাঁক, ছ্যাঁকছ্যাঁক। ছটফটে, ছলছলে ছলোছলো, ছ্যাঁকছেঁকে, ছিপছিপে॥

জরজর, জ্যাবজ্যাব, জ্যালজ্যাল। জবজবে, জিরজিরে, জ্যালজেলে, জিলজিলে॥

ঝকঝক, ঝকমক, ঝটপট, ঝড়াং, ঝন, ঝনঝন, ঝপ, ঝপঝপ, ঝপাঝপ, ঝমঝম, ঝমাৎ, ঝমাস, ঝমরঝমর, ঝমাজ্‌ঝম, ঝরঝর, ঝাঁ, ঝাঁঝাঁ, ঝিকঝিক, ঝিকমিক, ঝিকিমিকি, ঝিনঝিন, ঝিরঝির ঝুনঝুন, ঝুপঝুপ, ঝুমঝুম,। ঝকঝকে, ঝরঝরে, ঝিকঝিকে॥

টক, টকটক, টকাটক, টংটং, টন, টনটন, টপ, টপটপ, টপাটপ, টলটল, টলমল, টসটস, টিকটিক, টিকিসটিকিস, টিংটিং, টিপটিপ, টিমটিম, টুকটুক, টুকুসটুকুস, টুংটুং, টুংটাং, টুনটুন, টুপ, টুপটুপ, টুপুসটুপুস, টুপটাপ, টুসটুস, টেঁটো, ট্যাঁট্যাঁ, ট্যাঁসট্যাঁস, ট্যাঁঙসট্যাঁঙস। টকটকে, টনটনে, টলটলে, টসটসে. টিংটিঙে. টিপটিপে, টিমটিমে, টুকটুকে, টুপটুপে, টুসটুসে, ট্যাসটেসে॥

ঠক, ঠকঠক, ঠকরঠকর, ঠংঠং, ঠনঠন, ঠুক, ঠুকঠুক, ঠুকুরঠুকুর, ঠকাঠক, ঠকাৎ, ঠকাস, ঠুকুসঠুকুস, ঠুকঠাক, ঠুংঠুং, ঠুনঠুন, ঠ্যাঁংঠ্যাং, ঠ্যাসঠ্যাস। ঠনঠনে, ঠ্যাঁংঠেঙে॥

ডগডগে (লাল), ডিগডিগে॥

ঢক, ঢকঢক, ঢকাঢক, ঢকাস, ঢকাৎ, ঢবঢব, ঢলঢল, ঢুকঢুক, ঢুলঢুল, ঢ্যাবঢ্যাব। ঢকঢকে, ঢলঢলে, ঢুলঢুলে, ঢুলুঢুলু, ঢ্যাবঢেবে॥

তকতক, তড়তড়, তড়াত্তড়, তড়াক, তড়াকতড়াক, তরতর, তলতল, তুলতুল, তিড়িং তিড়িং তিড়িং, তড়াং, তড়াং তড়াং। তকতকে, তলতলে, তুলতুলে।

থকথক, থপ, থপাৎ, থপাস, থপথপ, থমথম, থরথর, থলথল, থসথস, থৈথৈ। থকথকে, থপথপে, থমথমে, থলথলে, থসথসে, থুড়থুড়ে, থ্যাসথেসে ॥

দগদগ, দপদপ, দবদব, দমদম, দমাদ্দম, দরদর, দড়াদ্দড়, দড়াম, দাউদাউ, দুদ্দুড়, দুদ্দাড়, দুপদুপ, দুপদাপ, দুমদুম, দুমদাম। দগদগে (রক্তবর্ণ বা অগ্নি) ॥

ধক্, ধকধক, ধড়ধড়, ধড়াস, ধড়াসধড়াস, ধড়াদ্ধড়, ধড়ফড়, ধড়মড়, ধপ, ধপধপ, ধপাধপ, ধমাস, ধবধব, ধম, ধমধম, ধমাদ্ধম, ধস, ধসধস, ধাঁধাঁ, ধাঁ, ধিকি, ধিকিধিকি, ধিনধিন, ধুকধুক, ধুম, ধুমধুম, ধুমধাম, ধুমাধুম, ধুপধাপ, ধূধূ, ধেইধেই। ধড়ফড়ে, ধপধপে, ধবধবে ধসধসে ॥

নড়নড়, নড়বড়, নড়রবড়র, নিশপিশ, নিড়বিড়। নড়নড়ে, নড়বড়ে, নিশপিশে, নিড়বিড়ে ॥

পট, পটপট, পটাপট, পটাৎ, পটাস, পটাসপটাস, পচপচ, পড়পড় (ছেঁড়া), প্‌ড়াস, প্‌ড়াৎ, প্‌ড়াং, প্‌ড়াংপ্‌ড়াং, প্‌ড়িংপ্‌ড়িং, পিটপিট, পিলপিল, পিঁপিঁ, পুট, পুটপুট, পোঁপোঁ, প্যাঁকপ্যাঁক, প্যাঁচপ্যাঁচ, প্যানপ্যান, প্যাঁটপ্যাঁট, পটাং, পটাংপটাং। পিটপিটে, পুসপুসে, প্যাঁচপেঁচে, প্যানপেনে ॥

ফটফট, ফটাফট, ফড়ফড়, ফড়রফড়র, ফটাৎ, ফটাস, ফড়াৎ, ফড়াস, ফনফন, ফরফর, ফস, ফসফস, ফসাফস, ফিক, ফিকফিক, ফিটফাট, ফিনফিন, ফুটফুট, ফুটফাট, ফুরফুর, ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎফুড়ুৎ, ফুস, ফুসফুস, ফুসফাস, ফোঁফোঁ, ফোঁফোঁ, ফোঁৎফোঁৎ, ফোঁচফোঁচ

ফোঁস, ফোঁসফোঁস, ফ্যাফ্যা ফ্যাঁকফ্যাঁক, ফ্যাঁচ, ফাঁচফ্যাঁচ, ফ্যাঁচরফ্যাঁচর, ফ্যাটফ্যাট, ফ্যালফ্যাল। ফুরফুরে, ফিনফিনে, ফুটফুটে, ফ্যাটফেটে, ফ্যালফেলে ॥

বকবক, বকরবকর, বজরবজর, বনবন, বড়বড়, বড়রবড়র, বিজবিজ, বিজিরবিজির, বিড়বিড, বিড়ির বিড়ির, বুগবুগ, বোঁ, বোঁবোঁ, ব্যাজব্যাজ ॥

ভকভক, ভড়ভড, ভনভন, ভুকভুক, ভুটভাট, ভুরভুর, ভুড়ুকভুড়ুক, ভোঁ, ভোঁভোঁ, ভাঁ, ভ্যাঁভ্যাঁ, ভ্যানভ্যান। ভ্যানভেনে ॥

মচ, মচমচ, মট, মটমট, মড়মড়, মড়াৎ, মসমস, মিটমিট, মিটিমিটি, মিনমিন, মুচ, মুচমুচে, ম্যাড়ম্যাড়, ম্যাজম্যাজ। মড়মড়ে, মিটমিটে, মিনমিনে, মিসমিসে মুচমুচে, ম্যাড়মেড়ে, ম্যাজমেজে ॥

রীরী, রিমঝিম, রিনিঝিনি, রুনুঝুনু, রৈরৈ, । রগরগে ॥

লকলক, লটপট, লিকলিক। লকলকে, লিকলিকে, লিংলিঙে ॥

সট, সটসট, সনসন, সড়সড়, সপসপ, সপাসপ সরসর, সিরসির, সাঁ, সাঁসাঁ, সাঁইসাঁই, সুট, সুটসুট, সুড়সুড়, সুড়ুৎ, সোঁসোঁ, স্যাঁৎস্যাঁৎ। স্যাঁৎসেতে ॥

হট, হটহট, হটরহটর, হড়হড, হড়াৎ, হড়বড়, হড়রবড়র, হনহন, হলহল, হড়রবড়র, হাউমাউ, হাহা, হাউহাউ, হাঁহাঁ, হাঁসফাঁস, হিহি, হিড়হিড়, হুহু, হুটহাট, হুড়হুড়, হুড়মুড় হুড়ুৎ, হুপহাপ, হুস, হুসহুস, হুসহাস, হোহো, হ্যাঁহ্যাঁ

(কুক্কুর) হ্যাটহ্যাট, হাপুস, হুপুস, হাপুরহুপুড়, হুড়োমুড়ি ॥

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরাজী ভাষাতেও আছে যথা bang, thud, dingdong, hiss ইত্যাদি—কিন্তু বাংলা ভাষার সহিত তুলনায় তাহা যৎসামান্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে তাহা প্রমাণ হইবে।

কিন্তু বাংলা ভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যে সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।

এরূপ ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষাবিপর্য্যয়ের উদাহরণ কেবল বাংলায় নহে, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। "মিষ্ট" বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে, মিষ্ট মুখ, মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্র জাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরাজীতে loud শব্দ ধ্বনির বিশেষণ হইলেও বর্ণের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে যথা loud colour। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলে, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে, এই শব্দগুলির আদিম ব্যবহার যতই সঙ্কীর্ণ থাক্, ক্রমেই তাহার অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। "মিষ্ট" শব্দ মুখ্যত স্বাদকে বুঝাইলেও এক্ষণে তাহার গৌণ অর্থ মনোহর দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলা-ই উচিত।

সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে তাহারা রীতিমতো সৈন্য নহে, অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমতো শব্দশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের, অথচ অজ্ঞাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলা ভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, বাংলা ভাষায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-বোধই অধিকাংশস্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়—কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া, অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। “তীরবেগে চলিয়া গেল” বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে; ‘সাঁ’ শব্দের অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিত ভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।

ইহার এক সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে এত বর্ণনাবৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ‘সাঁ করিয়া গেল’ এবং ‘গটগট করিয়া গেল’ উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে, অথচ উভয়ের

মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

এক কাটা সম্বন্ধে কত বিচিত্র বর্ণনা আছে। কচ করিয়া, কচাৎ করিয়া, কচকচ করিয়া কাটা, কচাকচ কাটিয়া যাওয়া, কুচ করিয়া, কট করিয়া, কটাৎ করিয়া, কটাস করিয়া, কঁ্যাচ করিয়া, ঘঁ্যাচ ঘঁ্যাচ করিয়া, ঝড়াৎ করিয়া,—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ কাটা সম্বন্ধে যত প্রকার বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভেদ ভাষান্তরে বিদেশীর নিকট ব্যক্ত করা অসম্ভব।

ইংরাজিতে গমন ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে; creep, crawl, sweep, totter, waddle ইত্যাদি। বাংলায় আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না— ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধান-তিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। খটখট করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট করিয়া, খুর-খুর করিয়া, খুটুসখুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধদ্ধড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া, চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে?

চলা, কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য্য নহে—কারণ গতি হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ছবি ধ্বনির সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাও বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয়। যেমন পাতলা জিনিষকে 'ফিন ফিন',

'ফুরফুর', ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা। পাতলা ফিনফিন করছে, বলিলে এ কথা কেহ বোঝে না যে, পাতলা বস্তু বাস্তবিক কোনো শব্দ করিতেছে, অথচ তদ্দ্বারা তনু পদার্থের তনুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছিপছিপে কথাটাও ঐরূপ—সরু বেতই বাতাসে আহত হইয়া ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এই জন্য ছিপ-ছিপে লোক বস্তুত কোনো শব্দ না করিলেও ছিপছিপে শব্দ দ্বারা তাহার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আনে। লকলকে, লিক-লিকে লিংলিঙে শব্দও এই শ্রেণীর।

কিন্তু ধ্বনির সহিত যে সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত ;—কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীতে শরীরে যে বেদনা বোধ হয়, আমাদের কল্পনার কোনো অদ্ভুত বিশেষত্ববশতঃ আমরা তাহাকে কনকন ধ্বনির সহিত তুলনা করি—অর্থাৎ আমরা মনে করি, সেই বেদনা যদি শ্রুতিগম্য হইত, তবে তাহা কনকন শব্দরূপে প্রকাশ পাইত।

আমরা শরীরের প্রায় সর্ব্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি—যথা কটকট, কনকন, করকর (চোখের বালি), কুটকুট, গা-ঘ্যান ঘ্যান (বা গা ঘিন্ ঘিন্),গা-চচ্চড়, চিনচিন, গা- ছমছম, ঝিনঝিন, দবদব, ধকধক, বুক-দুদ্দুড়, ম্যাজ ম্যাজ, সুড়সুড়, সড়সড়, রীরী। ইংরাজীতে এইরূপ শারীরিক বেদনা সকলকে, throbbing, gnawing, boring, crawling cutting, tearing, bursting প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত

করা হয়। আমরাও ছিঁড়ে পড়া, ফেটে যাওয়া কামড়ানো প্রভৃতি বিশেষণ আবশ্যকমতো ব্যবহার করি, কিন্তু উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে যাহা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা আর কিছুতে হইবার জো নাই। ঐ সকল ধ্বনির সহিত ঐ সকল বেদনার সম্বন্ধ যে কাল্পনিক, এক্ষণে আমাদের পক্ষে তাহা মনে করাই কঠিন। বাস্তবিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিরূপ বিসদৃশ উপমা আমাদের মনে উদিত হয়, "গা মাটি মাটি করা" বাক্যটি তাহার উদাহরণস্থল। মাটির সহিত শারীরিক অবস্থাবিশেষের যে কী তুলনা হইতে পারে তাহা বোঝা যায় না, অথচ "গা মাটিমাটি করা" কথাটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাববহ।

সর্ব্বপ্রকার শূন্যতা স্তব্ধতা, এমন কি; নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়োবাড়ি হাঁ হাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, কোথাও কেহ না থাকিলে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে—এই সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্য ভাষীদের নিকট কিরূপ জানি না, আমাদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ ;—ইংরাজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ, অন্তত আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট নহে।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও আশ্চর্য্য। টকটকে, টুকটুকে, ডগডগে, দগদগে, রগরগে লাল ; ফুটফুটে, ফ্যাটফেটে, ফ্যাকফেকে, ধবধবে শাদা ; মিসমিসে, কুচকুচে কালো।

টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে লাল অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই

আঘাত ক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়। কবির কর্ণে যেমন "silent spheres" অর্থাৎ নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের একটি সঙ্গীত উহ্যভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে, এও সেইরূপ। ঘোর লাল আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে যে আঘাত করে, তাহার যদি কোনো শব্দ থাকিত, তবে তাহা আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত করে, তখন তাহার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

কিন্তু ধবধব শব্দ সম্ভবতঃ গোড়ায় ধবল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংসর্গ বশতঃ নিজের অর্থ সম্পত্তি হারাইয়া ধ্বনির দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। জ্বলজ্বল শব্দ তাহার অন্যতর উদাহরণ;—জ্বলন শব্দ তাহার পিতৃপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সে কুলত্যাগী—সেই কারণে আমরা কোনো জিনিষকে "জলজল হইতেছে" বলি না—'জ্বলজ্বল করিতেছে' বলি—এই "করিতেছে" ক্রিয়ার পূর্ব্বে "ধ্বনি" শব্দ উহ্য। বাংলা ভাষায় এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। নদী কুলকুল করে, জুতা মচমচ করে, মাছি ভনভন করে, এরূপ স্থলে "শব্দ" করে বলা বাহুল্য;—শাদা ধব ধব করে বলিলেও বুঝায়, শ্বেত পদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে এক প্রকার অশব্দিত শব্দ করে। কোনো বর্ণ যখন তাহার উজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করে, তখন বলি ম্যাড়ম্যাড় করিতেছে। কেন বলি তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে, কিন্তু যেখানে ম্যাড়মেড়ে বলা আবশ্যক, সেখানে 'মলিন, ম্লান' প্রভৃতি আর কিছু বলিয়া কুলায় না।

"চিকচিক" গোড়ায় চিক্কণ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে প্রসঙ্গ এস্থলে আমি অনাবশ্যক বোধ করি। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এক্ষণে বিশুদ্ধ ধ্বনি মাত্র। চিকচিকে পদার্থের চঞ্চল জ্যোতি আমাদের চক্ষে একপ্রকার অশব্দ ধ্বনি করিতে থাকে তাহাকে আমরা চিক্‌চিক্ বলি—আবার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয়, তবে তাহা নীরবে চুক্‌চুক্ শব্দ করে, আমরা বলি তেল-চুক্‌চুকে। চিক্কণ পদার্থ যদি চঞ্চল হয়, যদি গতিবশতঃ তাহার জ্যোতি একবার একদিক হইতে একবার অন্যদিক হইতে আঘাত করে, তখন সেই জ্যোতি চিকচিক্ ঝিক্‌ঝিক্ বা ঝল্‌ঝল্ না করিয়া চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ ঝলমল করিতে থাকে অর্থাৎ তখন সে একটা শব্দ না করিয়া দুইটা শব্দ করে। কটমট করিয়া চাহিলে সেই দৃষ্টি যেন একদিক হইতে কট এবং আর একদিক হইতে মট করিয়া আসিয়া মারিতে থাকে, এবং ধ্বনির বৈচিত্র্য দ্বারা কাঠিন্যের ঐক্য যেন আরো পরিস্ফুট হয়।

অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে;—ধপ্ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস্ করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিষ কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিষ কচাৎ করিয়া কাটে।

আলোচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। দেখা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সীমা কোথায় অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষ জাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য ইহারা নিযুক্ত। প্রথমতঃ ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটাবিভাগ করা যায়—

অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ঐ দলে ধরা যাইতে পারে। যথা, মাঠ ধুধু করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধুধু এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্ম্মী। চকচকে জিনিষ স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তকতক করে, তাহার আভাও স্থির নহে। বর্ণ জলজলে হউক বা ম্যাড়মেড়ে হউক, তাহার আভা আছে।

বাংলা ভাষায় স্থিরত্ব বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

গট্ হইয়া বসা, গুম্ হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, বুঁদ্ হইয়া যাওয়া। গট্, গুম এবং ভোঁ ধ্বন্যাত্মক বটে, কিন্তু আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যেও গুম্‌ভাবে একটি আবদ্ধ আবেগ আছে;—যেন গতি স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভোঁ ভাবের মধ্যেও একটি আবেগের বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। ইহারা একান্ত স্থিতিবোধক নহে, স্থিতির মধ্যে গতির আভাসবোধক। যাহাই হউক এরূপ উদাহরণ আরো যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যল্প।

স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব, বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই।

অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্য্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্ব্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সঙ্কেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সঙ্কেত।

গদ্য ও পদ্যের প্রভেদও এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্ব্বচনীয়কে সঙ্কেতে প্রকাশ করে।

আমাদের বর্ণনায় যে অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্ব্বচনীয়তর, সেইগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলা ভাষায় এই সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যাহা চঞ্চল, যাহার বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হইবার নহে, তাহাদের জন্য এই ধ্বনিগুলি সঙ্কেতের কাজ করিতেছে।

আমার তালিকা আকারাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশতঃ সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন, কর্ত্তন, পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কিনা। ঐক্য থাকাই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত অথবা টকারান্ত;—কচ এবং কট—তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন

কচ এবং গুরু অন্তে কট। এই পর্য্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত :—কঁ্যাচ, খ্যাঁচ, গ্যাঁচ, ঘ্যাঁচ।

পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া এইরূপ পর্য্যায় বিভাগে সহায়তা করিবেন এই আশা করি।

জ্যাবড়া, ধ্যাবড়া, অ্যাব্ড়া-খ্যাবড়া, হিজিবিজি, হাবজা গোবজা, হোমরা-চোমরা, হেজিপেঁজি, ঝাপ্সা, ভাবসা, ঝুপ্সি, ঢ্যাপ্সা, হোঁৎকা, গোম্‌সা, ধুম্‌সো ঘুপসি, মটকা মারা, মিটকি মারা, গুঁড়ি মারা, উঁকি মারা, টেবো, ট্যাবলা, ভেবড়ে যাওয়া, মুষড়ে যাওয়া প্রভৃতি বর্ণনামূলক খাঁটি বাংলা শব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসঙ্কলনে পাঠকদিগকে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

১৩০০

বাংলা শব্দদ্বৈত

ব্রুগ্‌মান্ তাঁহার ইণ্ডো-জর্ম্মাণীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা পুনর্বৃত্তি (repetition), দীর্ঘকালবর্ত্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইণ্ডো-জর্ম্মাণীয় ভাষার অভিব্যক্তি দশায় পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইণ্ডোজর্ম্মাণ ভাষায় অনেক দ্বিগুণিত শব্দ কালক্রমে সংযুক্ত

হইয়া এক হইয়া গেছে ; সংস্কৃত ভাষায়, তাহার দৃষ্টান্ত, মর্ম্মর, গর্গর (ঘড়া, জল শব্দের অনুকরণে), গদ্‌গদ, বর্ব্বর (অস্পষ্টভাষী), কঙ্কণ। দ্বিগুণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে ; যথা কর্কশ, কঙ্কর, ঝঞ্ঝা, বম্ভর (ভ্রমর), চঞ্চল।

অসংযুক্ত ভাবে দ্বিগুণীকরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে, যথা, কালে কালে, জন্মজন্মনি, নব নব, উত্তরোত্তর, পুনঃ পুনঃ, "পীত্বা, পীত্বা," যথা যথা, যদ্‌যৎ, অহরহঃ, প্রিয়ঃপ্রিয়ঃ, সুখ-সুখেন, পুঞ্জপুঞ্জেন।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে হয় পুনরাবৃত্তি, নয় প্রগাঢ়তার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্য্য ভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র ; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তগুলি একত্র করা যাক্। মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়—এগুলি পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে, মানুষে মানুষে,—এগুলি পরস্পর সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে,

উপরে উপরে—এগুলি নিয়তবর্ত্তিতাবাচক। অর্থাৎ এগুলিতে, সর্ব্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করে।

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া—এগুলি দীর্ঘকালীনতাবাচক।

অন্য অন্য, অনেক অনেক. নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুক্‌রা টুক্‌রা—এগুলি বিভক্ত বহুলতাবাচক। "নূতন নূতন কাপড়" বলিলে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করিয়া দেখা হয়। "অনেক অনেক লোক" বলিলে লোকগুলিকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ "অনেক লোক" বলিলে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

লাল লাল, কালো কালো, লম্বা লম্বা, মোটা মোটা, রকম রকম—এগুলিও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর। লাল লাল ফুল বলিলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি লাল ফুল বুঝায়।

যাকে যাকে, যেমন যেমন, যেখানে যেখানে, যখন যখন, যত যত, যে যে, যারা যারা—এগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে—এ দুইটিও ঐ প্রকার। আশায় আশায় আছি অর্থাৎ প্রত্যেক বার আশা হইতেছে; ভয়ে ভয়ে আছি অর্থাৎ বারংবার ভয় হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে আশা বা ভয় উদ্রেক করিতেছে।

মুঠো মুঠো, ঝুড়ি ঝুড়ি, বস্তা বস্তা এগুলিও পূর্ব্বানুরূপ।

টাট্‌কা-টাট্‌কা, গরম-গরম, ঠিক-ঠিক—এগুলি প্রকর্ষ-বাচক।

টাট্‌কা-টাট্‌কা বলিলে টাট্‌কা শব্দকে বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

চার- চার, তিন-তিন এগুলিও পূর্ব্ববৎ। চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির, অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।

গলায় গলায় (আহার), কানে কানে (কথা)—ইহাও পূর্ব্ব শ্রেণীর; অর্থাৎ অত্যন্তই গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ; নিতান্তই কানের নিকটে গিয়া কথা। "হাতে হাতে" (ফল, বা ধরা পড়া) বোধ করি স্বতন্ত্রজাতীয়। বোধ করি তাহার অর্থ এই, যে, যেমনি হাত দিয়া কাজ করা, অমনি সেই হাতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া, যে হাতে চুরি করা সেই হাতেই ধৃত হওয়া।

নিজে নিজে, আপ্‌নি-আপ্‌নি তখনি তখনি—পূর্ব্বানুরূপ। অর্থাৎ বিশেষরূপে নিজেই, আপনিই আর কেহই নহে, বিলম্বমাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ। "সকাল সকাল" শব্দও বোধ করি এই জাতীয়, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দ্রুতরূপে সকাল।

জ্বল্ জ্বল্, চুর্ চুর্, ঘুর্ ঘুর্, টল্ টল্, নড়্ নড়্ এগুলি জ্বলন চূর্ণন, ঘূর্ণন, টলন, নর্ত্তন শব্দজাত; এগুলিতেও প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাংলা অনেকগুলি শব্দদ্বৈতে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে। যথা—যাব যাব, উঠি উঠি।

মেঘ-মেঘ, জ্বর-জ্বর, শীত-শীত, মর্-মর্, পড়ো-পড়ো, ভরা-ভরা, ফাঁকা-ফাঁকা, ভিজে-ভিজে, ভাসা-ভাসা, কাঁদো-কাঁদো, হাসি-হাসি।

মানে-মানে, ভাগ্যে-ভাগ্যে শব্দের মধ্যেও এই ঈষদূনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন অর্থে, মান প্রায় যায় যায় করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ যেটুকু ভাগ্যসূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ।

ঘোড়া-ঘোড়া (খেলা) চোর-চোর (খেলা), এই জাতীয়। অর্থাৎ সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারি নকল করিয়া খেলা।

এইরূপ ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আর্য্য ভাষায় দেখা যায় না। ফরাসী ভাষায় একপ্রকার শব্দ-ব্যবহার আছে, যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসী চলিত ভাষায় কোনো জিনিষকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব্ব করিয়া লইতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে। যথা me-mere, মে-মেয়ার, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার্ অর্থে মা, মে-মেয়ার অর্থে ছোট্ট মা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। Bete বেট্ শব্দের অর্থ জন্তু, be-bete বে-বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট পশু, আদরের পশুটি। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্ব্বতা বুঝাইতেছে।

আর একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাংলায় এবং বোধ করি ভারতীয় অন্য অনেক আর্য্য ভাষায় চলিত আছে, তাহা অনির্দ্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক। যেমন, জল-টল, পয়সা-টয়সা। জল-টল বলিলে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে ক'টা আনুষঙ্গিক জিনিষ শ্রোতার মনে উদয় হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যায়।

বোঁচ্কা-বুঁচ্কি, দড়া-দড়ি, গোলা-গুলি, কাটি-কুটি, গুঁড়াগাঁড়া,

কাপড়-চোপড় এগুলিও প্রভৃতি-বাচক বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নির্দ্দিষ্টতর। বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি বলিলে ছোটো বড়ো মাঝারি এক জাতীয় নানা প্রকার বোঁচ্‌কা বোঝায়, অন্য জাতীয় কিছু বোঝায় না।

মহারাষ্ট্রী হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্য্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার সহিত তৎতৎ ভাষার শব্দদ্বৈত বিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

১৩০৭

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত।

প্রবন্ধ আরম্ভে বলা আবশ্যক, যে সকল বাংলা শব্দ লইয়া আলোচনা করিব, তাহার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্ত্তমান কালে কলিকাতা ছাড়া বাংলা দেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।

আজ পর্য্যন্ত বাংলা অভিধান বাহির হয় নাই; সুতরাং বাংলা শব্দের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে নিজের অসহায় স্মৃতিশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করিবার দোষ এই যে, স্মৃতি অনেক সময় অযাচিত অনুগ্রহ করে, কিন্তু প্রার্থীর প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণে প্রবন্ধে পদে পদে অসম্পূর্ণতা থাকিবে।

আমি কেবল বিষয়টার সূত্রপাত করিবার ভার লইলাম, তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার সুধীসাধারণের উপর।

আমার পক্ষে সঙ্কোচের আর একটি গুরুতর কারণ আছে। আমি বৈয়াকরণ নহি। অনুরাগবশত বাংলা শব্দ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি; কখনো কখনো বাংলার দুটা একটা ভাষাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী নহি বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হই নাই। এ প্রবন্ধে পাঠকেরা আনাড়ির পরিচয় পাইবেন, কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। অতএব শ্রমের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবে, আশা করিয়াই সাহিত্য-পরিষদে এই বাংলা ভাষাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রাকৃত বাংলা ও কোন্‌গুলি সংস্কৃত, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্‌ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেই জন্য তাহা সংস্কৃত পূর্ব্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন্‌ হয় না। বাংলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন, কিন্তু তাহা শতৃ-প্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়ন্ত ফুটন্ত ইত্যাদিরূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না।

বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলা প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত রঞ্জিতশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু বাংলায় ত প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই, সেইজন্য আমরা রঙিত বলি না। সজ্জিত হয়, সাজিত হয় না ; অতএব ত প্রত্যয় বাংলা প্রত্যয় নহে।

হিন্দি পারসী প্রভৃতি হইতে বাংলায় যে সকল প্রত্যয়ের আমদানী হইয়াছে. সে সম্বন্ধেও আমার ঐ একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবতঃ হিন্দি বা পারসি,—কিন্তু বাংলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া ট্যাক্‌সই, প্রমাণসই মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ওয়ান প্রত্যয় সেরূপ নহে। গাড়োয়ান, দারোয়ান, পালোয়ান শব্দ আমরা হিন্দী হইতে বাংলায় পাইয়াছি, প্রত্যয়টি পাই নাই।

অর্থাৎ যে সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দ-সহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনো প্রকার আদান প্রদান করিতেছে না. তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না।

যে সকল কৃৎতদ্ধিতের সাহায্যে বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহারই উল্লেখ থাকিবে ; ক্রিয়াপদসম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধে বিশেষ্য বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। ক্রিয়াবাচক ও পদার্থবাচক। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা,—চলা, বলা, সাঁৎরানো, বাঁচানো ইত্যাদি। পদার্থবাচক যথা, হাতি ঘোড়া

জিনিষপত্র ঢেঁকি কুলা ইত্যাদি। গুণবাচক প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োজন হয় নাই।

ও প্রত্যয়।

এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ শব্দের সৃষ্টি হয়। যথা, কট্‌মট্ শব্দের উত্তর ও প্রত্যয় হইয়া কটোমটো (কটোমটো ভাষা, কটোমটো দৃষ্টি) টল্‌মল্ হইতে টলোমলো। *

আসন্নপ্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে বিশেষণ হয় তাহাতে এই ও প্রত্যয়ের হাত আছে; যথা পড়্‌ধাতু হইতে পড়ো-পড়ো, পাক্‌ধাতু হইতে পাকো-পাকো, মর্‌ধাতু হইতে মরো-মরো, কাঁদ্‌ধাতু হইতে কাঁদো-কাঁদো। অন্য অর্থে হয় না, যথা—কাটাকাটা (কথা), পাকাপাকা, ছাড়াছাড়া ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খাস বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ হলন্ত নহে। বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে ভালো শব্দ ভাল্ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা

---

* দ্রষ্টব্য—এই যে, ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতে সর্ব্বত্র এ নিয়ম খাটে না। যথা আমরা টক-টক লাল, বা খট-খট রৌদ্র, বা টন-টন ব্যথা বলি না; সেস্থলে টক্‌টকে খট্‌খটে টন্‌টনে বলিয়া থাকি। কট্‌মট্ টল্‌টল্, জ্বলজ্বল্, শব্দ হইতে বিকল্পে, কটোমটো, কট্‌মটে; টলোমলো, টল্‌মলে; জ্বলোজ্বলো, জ্বল্‌জ্বলে হইয়া থাকে।

ওকারান্ত উচ্চারণ করি। * বস্তুতঃ বাংলায় অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ অতি অল্পই দেখা যায়; অধিকাংশই বিশেষণ। যথা, বড়ো, ছোটো, মাঝো (মাঝো, মেঝো), ভালো, কালো, খাটো (ক্ষুদ্র), জড়ো, (পুঞ্জীকৃত) ইত্যাদি।

বাকী অনেকগুলা বিশেষণই আকারান্ত; যথা, কাঁচা. পাকা, বাঁকা, তেড়া, সোজা, সিধা, শাদা, মোটা, মুলা, বোবা, কালা, ন্যাড়া, কানা, তিতা, মিঠা, উঁচা, বোকা ইত্যাদি।

আ প্রত্যয়।

পূর্ব্বোক্ত আকারান্ত বিশেষণগুলিকে আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া অনুমান করিতেছি। সংস্কৃত শব্দ কাণ, বাংলায় বিশেষণ হইবার সময় কানা হইল, মৃত হইতে মড়া হইল, মহৎ হইতে মোটা হইল, সিত হইতে শাদা হইল। এই আকারগুলি উচ্চারণের নিয়মে আপনি আসে নাই। বিশেষণে হলন্ত প্রয়োগ বর্জ্জন করিবার একটা চেষ্টা বাংলায় আছে বলিয়াই যেখানে সহজে অন্য কোনো স্বরবর্ণ জোটাইতে পারে নাই, সেই সকল স্থলে আ প্রত্যয় যোগ করিয়াছে!

সংস্কৃত ভাষার "স্বার্থে ক" বাংলায় আ প্রত্যয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘোটক, ঘোড়া; মস্তক, মাথা; পিষ্টক, পিঠা; কণ্টক কাঁটা; চিপিটক চিঁড়া; গোপালক, গোয়ালা; কুল্যক, কুলা।

বাংলায় অনেক শব্দ আছে যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয়

* বাংলা অ অনেকস্থলেই হ্রস্ব ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি যত, উচ্চারণ করি যতো, লিখি বড়, উচ্চারণ করি বড়ো। উড়িয়ার বড় বাঙালীর বড়র সহিত তুলনা করিলে দুই অকারের প্রভেদ বুঝা যাইবে।

গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই। যেমন তক্ত, তক্তা; বাঘ, বাঘা; পাট, পাটা; ল্যাজ, ল্যাজা; চোঙ, চোঙা; চাঁদ, চাঁদা; পাত, পাতা; ভাই, ভাইয়া (ভায়া); বাপ, বাপা; থাল, থালা; কালো, কালা; তল, তলা; ছাগল, ছাগ্‌লা; বাদল, বাদ্‌লা; পাগল, পাগ্‌লা; বামন, বাম্‌না; বেল, (ফুল) বেলা; ইলিষ, ইল্‌ষা (ইল্‌ষে)।

এই আ প্রত্যয়যোগে অনেকস্থলে অবজ্ঞা বা অতিপরিচয় জ্ঞাপন করে। বিশেষতঃ মানুষের নাম সম্বন্ধে। যথা, রাম, রামা; শাম, শামা; হরি, হরে (হরিয়া); মধু, মোধো (মধুয়া); ফটিক, ফট্‌কে (ফট্‌কিয়া)।

দ্রষ্টব্য এই যে, সকল নামে আ প্রত্যয় হয় না; যাদবকে যাদ্‌বা, মাধবকে মাধ বা বলে না। শ্রীশ, প্রিয়, পরাণ প্রভৃতিও এইরূপ। বাংলা নামের বিকার সম্বন্ধে কোনো পাঠক আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে আনন্দিত হইব।

স্বার্থে আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া গেছে, তাহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না। আবার আ প্রত্যয়ে অর্থের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে, এমন উদাহরণও আছে। যেমন হাত হইতে হাতা (রন্ধনের হাতা, জামার হাতা, অর্থাৎ হাতের মতো পদার্থ); ঠ্যাঙ হইতে ঠ্যাঙা (ঠ্যাঙের ন্যায় পদার্থ); ভাত হইতে ভাতা (খোরাকী) বাস হইতে বাসা; ধোব হইতে ধোবা।

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়। বাঁধ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া বাঁধা; ঝর্ ধাতুর

উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ঝরা। ইহারা বিশেষ্য বিশেষণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ যেমন বাঁধা হাত; বিশেষ্য যেমন হাত বাঁধা।

দ্রষ্টব্য এই যে, কেবল একমাত্রিক অর্থাৎ monosyllabic ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে। যেমন, ধর্ মার্ চল্ বল্ হইতে ধরা মারা চলা বলা। বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ সংযোগ হয় না। যেমন আঁচড় হইতে আঁচ্ড়া, আছাড় হইতে আছড়া হয় না।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র বিশেষণরূপে হইতে পারে। যেমন থ্যাৎলা মাংস, কোঁক্‌ড়া চুল। বাঘ-আঁচ্ড়া গাছ, নেই-আঁক্‌ড়া লোক, (ন্যায়-আঁক্‌ড়া অর্থাৎ নৈয়ায়িক তার্কিক)।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গেল। আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দুই একটি মনে পড়িতেছে;—তাওয়া (যাহাতে রুটিতে তা দেওয়া যায়); দাওয়া (দাবী, অর্থাৎ দাও বলিবার অধিকার); আছ্ড়া (আঁটি হইতে ধান আছড়াইয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে)।

বিশিষ্ট অর্থে আ প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা, তেলবিশিষ্ট তেলা, বেতালবিশিষ্ট বেতালা; বেসুরবিশিষ্ট বেসুরা; জলময় জলা; নুন্ বিশিষ্ট নোনা (লবণাক্ত); আলোকিত আলা; রোগযুক্ত রোগা; মলযুক্ত ময়লা; চালযুক্ত চালা (ঘর) মাটিযুক্ত মাটিয়া (মেটে) বালিযুক্ত বালিয়া (বেলে, দাড়ি যুক্ত দাড়িয়া (দেড়ে)।

বৃহৎ অর্থে আ প্রত্যয় ; যথা হাঁড়া (ক্ষুদ্র, হাঁড়ি) ; নোড়া (লোষ্ট্র হইতে ; ক্ষুদ্র, নুড়ি)

আন্ প্রত্যয়।

আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত। যোগান্, চাপান্, চালান্, জানান্, হেলান্, ঠেসান্, মানান্।

এগুলি ছাড়া একপ্রকার বিশেষ পদবিন্যাসে এই আন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ঠকা হইতে ঠকান্ শব্দ বাংলায় সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু আমরা বলি, ভারি ঠকান্ ঠকেছি, অথবা, কী ঠকান্‌টাই ঠকিয়েছে। সেইরূপ, "কী পিটোন্‌টাই পিটিয়েছে," "কী চলান্‌টাই চলিয়েছে" এরূপ বিস্ময়সূচক পদবিন্যাসের বাহিরে "পিটান্, চলান্" ব্যবহার হয় না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। পদার্থবাচকের দৃষ্টান্তও আছে ; যথা, বানান্, উঠান্, উনান্, উজান্ (ঊর্দ্ধ— উঝ + আন্), ঢালান্ (জলের), মাচান্ (মঞ্চ)।

আন্ + ও প্রত্যয়।

আন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ অ প্রত্যয় করিয়া বাংলায় অনেকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, একমাত্রিক ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়াবাচক দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সিদ্ধ হয় ; যেমন ধরা মারা ইত্যাদি।

বহুমাত্রিকে আ প্রত্যয় না হইয়া আন্ ও তদুত্তরে ও প্রত্যয়

হয়। যেমন চুল্‌কান (উচ্চারণ চুল্‌কানো), কাম্‌ড়ান (কাম্‌ড়ানো), ছট্‌ফটান (ছট্‌ফটানো) ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণত ণিজন্ত ক্রিয়াপদকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণে পরিণত করিতে আন্‌+ও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, করা শব্দ হইতে করানো, বলা হইতে বলানো।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন পড়া হইতে পাড়া ; চলা হইতে চালা ; গলা হইতে গালা ; নড়া হইতে নাড়া ; জ্বলা হইতে জ্বালা ; মরা হইতে মারা ; বহা হইতে বাহা ; জরা হইতে জারা।

কিন্তু পড়া হইতে পড়ান, নড়া হইতে নড়ান, চলা হইতে চলান, ইহাও হয়। এমন কি, চালা, নাড়া, পাড়া প্রভৃতির উত্তর পুনশ্চ আন্‌+ও যোগ করিয়া চালানো, পাড়ানো, নাড়ানো হইয়া থাকে।

কিন্তু তাকান, গড়ান (বিছানায়), আঁচান প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধে কী বুঝিতে হইবে ? তাকা, গড়া, আঁচা হইল না কেন ?

তাহার কারণ, এইগুলির মূল ধাতু একমাত্রিক নহে। “দেখ্” একমাত্রিক ধাতু, তাহা হইতে “দেখা” হইয়াছে ; কিন্তু তাকান শব্দের মূল ধাতুটি তাক্ নহে, তাহা তাকা—সেই জন্যই উক্ত ধাতুকে বিশেষ্য করিতে আন্‌+ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। নামধাতুগুলিও আন্‌+ও প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে, যেমন লাথ্ হইতে লাথান পিঠ্ হইতে পিঠান (পিটোনো), হাত হইতে হাতান।

মূল ধাতু বহুমাত্রিক কি না, তাহা পরীক্ষার অন্য উপায় আছে।

অনুজ্ঞায় আমরা "দেখ্" ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "দেখো," কিন্তু "তাকো" বলি না; "তাকা" ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "তাকাও"। গঠন করো বলিতে হইলে গড়্ ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "গড়ো," কিন্তু "শয়ন করো" বুঝাইতে হইলে "গড়া" ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "গড়াও"।

আমাদের বহুমাত্রিক ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি আকারান্ত, সেইজন্য পুনশ্চ তাহার উত্তর আ প্রত্যয় না হইয়া আন্+ও প্রত্যয় হয়। মূল শব্দটি "আট্কা" বা চম্কা না হইলে অনুজ্ঞায় "আট্কাও" হইত না, "চম্কাও" হইত না। হিন্দিতে "পাকড়্" শব্দের উত্তর "ও" প্রত্যয় হইয়া "পাকড়ো" হয়; সেই শব্দই বাংলায় "পাক্ড়া" রূপ ধরিয়া "পাক্ড়াও" হইয়া দাঁড়ায়।

অন্ প্রত্যয়।

দৃষ্টান্ত—মাতন্, চলন্, কাঁদন্, গড়ন্ (গঠন ক্রিয়া), ইত্যাদি। ইহারা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ।

অন্ প্রত্যয়সিদ্ধ পদার্থবাচক শব্দের উদাহরণও মনে পড়ে :— যেমন, ঝাড়ন্, বেলুন্ (রুটি বেলিবার), মাজন্, গড়ন্ (শরীরের), ফোড়ন্, ঝোঁটন্ (ঝুঁটি হইতে); পাঁচন্।

অন্+আ প্রত্যয়।

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ আ প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা বিকল্পে বিশেষ্যও হয়। যেমন পাওন্ হইতে পাওনা, দেওন্ হইতে দেনা; ফেলন্ হইতে ফেল্না; মাগন্ হইতে মাগ্না, শুকন্ হইতে শুক্না।

পদার্থবাচক বিশেষ্যেরও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, বাট্‌না, কুট্‌না, ওড়্‌না, ঝর্‌না, খেল্‌না, বিছানা, বাজ্‌না, ঢাক্‌না।

ই প্রত্যয়।

ধর্ম্ম ও ব্যবসায় অর্থে :—গোলাপি, বেগুনি, চালাকি, চাকুরি, চুরি, ডাক্তারি, মোক্তারি, ব্যারিষ্টারি, মাষ্টারি। খাড়াই (খাড়া পদার্থের ধর্ম্ম), লম্বাই ; চৌড়াই ; ঠাণ্ডাই ; আড়ি (আড় অর্থাৎ বক্র হইবার ভাব)।

অনুকরণ অর্থে :—সাহেবি, নবাবি।

দক্ষ অর্থে—হিসাবদক্ষ হিসাবি, আলাপদক্ষ আলাপি, ধ্রুপদদক্ষ ধ্রুপদি।

বিশিষ্ট অর্থে—দামবিশিষ্ট দামি, দাগবিশিষ্ট দাগি, রাগবিশিষ্ট রাগি, ভারবিশিষ্ট ভারি।

ক্ষুদ্র অর্থে—হাঁড়ি, পুঁটুলি, কাঠি। (ইহাদের বৃহৎ হাঁড়া, পোঁটলা, কাঠ)।

দেশীয় অর্থে—মারাঠি, গুজরাটি, আসামি, পাটনাই, বসরাই।

স্বার্থে—হাস হাসি; ফাঁস ফাঁসি; লাথ, লাথি; পাড় (পুকুরের) পাড়ি। কড়া, কড়াই (কটাহ)।

দিন নির্দ্দেশ অর্থে—পাঁচই, ছউই, সাতই, আটই, নওই, দশই, এইরূপে আঠারই পর্য্যন্ত।

আ+ই প্রত্যয়।

ক্রিয়াবাচক,—বাছাই, যাচাই, দলাই মলাই (ঘোড়াকে), খোদাই, ঢালাই, ধোলাই, ঢোলাই, বাঁধাই, পালটাই।

পদার্থবাচক—মড়াই (ধানের), বালাই (বালকের অকল্যাণ), মিঠাই।

মনুষ্যের নাম—বলাই, কানাই, নিতাই, জগাই, মাধাই।

ধর্ম্ম। বড়াই (বড়ত্ব); বামনাই; পোষ্টাই (পুষ্টের ধর্ম্ম)।

ই+আ।

জাল শব্দ ই প্রত্যয় যোগে জালি, স্বার্থে আ—জালিয়া (জেলে)। এইরূপ কোঁদলিয়া (কুঁদুলে), জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে), গোবরিয়া (গুবরে), সাঁৎস্যাতিয়া (স্যাঁৎসেঁতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয়।

চালু (চলনশীল), ঢালু (ঢালুবিশিষ্ট), নিচু (নিম্নগামী), কলু (ঘানিকলবিশিষ্ট), গাড়ু (গাগর শব্দ হইতে গাগরু), আগু পিছু (অগ্রবর্ত্তী পশ্চাদ্বর্ত্তী,।

মানুষের নাম—যাদব হইতে যাদু, কালা হইতে কালু, শিব হইতে শিবু, পাঁচকড়ি হইতে পাঁচু।

উ+আ প্রত্যয়।

বিশিষ্ট অর্থে। যথা—জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো), জাঁকুয়া (জেঁকো), বাতুয়া (বেতো)। পড়ুয়া (পোড়ো)।

সম্বন্ধ অর্থে। মাছুয়া (মেছো), বুনুয়া (বুনো), ঘরুয়া (ঘোরো), মাঠুয়া (মেঠো)।

নির্ম্মিত অর্থে। কাঠুয়া (কেঠো), ধানুয়া (ধেনো)।

আ+ও প্রত্যয়।

ঘেরাও, চড়াও, উধাও, ফেলাও (ফলাও)।

ও+আ প্রত্যয়।

বাঁচোয়া, ঘরোয়া, চড়োয়া, ধরোয়া, আগোয়া।

অন্+ই প্রত্যয়।

মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় কেবল একমাত্রিক ধাতুতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন ধর্ হইতে ধর্না (ধন্না), কাঁদ্ হইতে কাঁদ্না (কান্না)। কিন্তু বহুমাত্রিক শব্দের উত্তর এরূপ হয় না। আমরা কামড়ানা, কটকটানা বলি না, তাহার স্থলে কামড়ানি, কটকটানি বলিয়া থাকি। অর্থাৎ অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় না করিয়া ই প্রত্যয় করিয়া থাকি।

"অন্" প্রত্যয়ের উত্তর "ই" প্রত্যয় একমাত্রিকেও হয়। যথা, মাতনি (মাতুনি), বাঁধনি (বাঁধুনি), জ্বলনি (জ্বলুনি), কাঁপনি (কাঁপুনি, দাপনি (দাপুনি), আঁটনি (আঁটুনি)।

মূল ধাতুটি হলন্ত কিম্বা আকারান্ত, তাহা এই অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে জানা যাইতে পারে। তাকনি না হইয়া তাকানি হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে মূল ধাতুটি তাকা। এইরূপ আছড়া, চট্কা, কাম্ড়া ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয় ভাব ব্যক্ত করে। যথা, বকুনি, ধমকানি, চমকানি, হাঁপানি, শাসানি, টাটানি, নাকানি-চোবানি, কাঁদুনি, জ্বলুনি, কাঁপুনি, ফোঁস্লানি,

ফোঁপানি, গেঙানি, ঘ্যাঙানি, খ্যাঁচ্‌কানি কোঁচ্‌কানি (ভুরু), খাঁকানি (মুখ), খিঁচুনি (দাঁত) খ্যাঁকানি, ঘস্‌ড়ানি, ঘুরুনি (চোখ), চাপুনি, চেঁচানি, ভ্যাঙানি (মুখ) রগড়ানি, রাঙানি (চোখ), লাফানি, ঝাঁপানি।

ব্যতিক্রম—বাঁধুনি (কথার), শুনানি, দুলুনি, বুনুনি (কাপড় বা ধান), বাছনি (বাছাই)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে যেগুলি অসুখব্যঞ্জক, তাহার উত্তরেই অন্‌+ই প্রত্যয় হয়। যথা—দব্‌দবানি, ঝন্‌ঝনানি, কন্‌কনানি, টন্‌টনানি ছটফটানি, কুট্‌কুটুনি ইত্যাদি।

অন্‌+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার কয়েকটি পদার্থবাচক বিশেষ্যপদ সিদ্ধ হয়। দৃষ্টান্ত—ছাঁকনি, নিড়নি, চালুনি, বিননি (চুলের) চাট্‌নি, ছাউনি, নিছনি, তলানি (তরলপদার্থের তলায় যাহা জমে)।

ব্যক্তি ও বস্তুর বিশেষণ :—রাঁধুনি (ব্রাহ্মণ), ঘুম-পাড়ানি, পাট-পচানি ইত্যাদি।

না প্রত্যয়।

না প্রত্যয় যোগে অর্থের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। পাখা, পাখনা; জাব (গরুর) জাবনা; ফাতা (ছিপের) ফাৎনা; ছোট ছোটনা (ধান)।

আনা।

বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা, নবাবিয়ানা, মুন্সিয়ানা। ই প্রত্যয় করিয়া হিঁদুয়ানি।

ল্ প্রত্যয়।

কাঁকুড়োল (কাঁকুড় হইতে), হাবল, খাবল, পাগল (পাকল, পাক অর্থাৎ ঘূর্ণাবিশিষ্ট), হাতল, মাতাল (মত্ত হইতে মাতা)।

র্ প্রত্যয়।

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর এই র প্রত্যয়ে অবিরামতা বুঝায়। যথা গজ্ গজ্ হইতে গজর্ গজর্, বক্‌বক্ হইতে বকর্ বকর্, নড়্‌বড়্ হইতে নড়র্ বড়র্, কটমট হইতে কটর্ মটর্, ঘ্যান্‌ঘ্যান হইতে ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, কুট্‌কুট্ হইতে কুটুর্ কুটুর্।

আল্ প্রত্যয়।

দয়াল্, কাঙাল্ (কাঙ্ক্ষালু), বাচাল। আঁঠিয়াল্। আড়াল্। মিশাল্।

ল্+আ।

মেঘলা, বাদলা, পাতলা, শামলা, আধলা, ছ্যাৎলা, একলা, দোকলা, চাকলা।

ল্+ই+আ।

দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে), আগলিয়া (আগলে), পাছলিয়া (পাছ্‌লে), ছুটলিয়া (ছুট্‌লে)।

আড়্।

জোগাড়, লাগাড় (নাগাড়), সাবাড়, লেজুর, খেলোয়াড়, উজাড়।

আড়্+ই+আ।

বাসাড়িয়া (বাসাড়ে) জোগাড়িয়া (জোগাড়ে), মজাড়িয়া (মজাড়ে) হাতাড়িয়া (হাতুড়ে, যে হাতড়াইয়া বেড়ায়)। কাঠুরে, হাটুরে, ঘেসুড়ে, ফাঁসুড়ে, চাষাড়ে।

রা ও ড়া।

টুকরা, চাপড়া, ঝাঁকড়া, পেটরা, চামড়া, ছোকরা, গাঁটরা, ফোঁপরা, ছিবড়া, থাবড়া, বাগড়া, খাগড়া।

বহু অর্থে। রাজারাজড়া, গাছগাছড়া, কাঠকাঠরা।

আরি।

জুয়ারি, কাঁসারি, চুনারি, পূজারি, ভিখারি।

আরু।

সজারু (শল্যবিশিষ্ট জন্তু) ; লাফারু (কোনো কোনো প্রদেশে খরগসকে বলে) ; দাবাড়ু (দাবা খেলায় মত্ত)।

ক্।

মড়ক, চড়ক, মোড়ক, বৈঠক, চটক, ঝলক, চমক, আটক।

আক্, উক্, ইক্।

এই সকল প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়ার বিশেষণগুলি হয়, তাহাতে দ্রুতবেগ বুঝায়। যথা :—

ফুড়ুক্, তিড়িক্, তড়াক্, চিড়িক্, ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক্+আ।

মটকা, বোঁচকা, হাল্‌কা, বোঁটকা, হোঁৎকা, উচক্কা। ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় করিয়া মটকি, বুঁচকি ইত্যাদি হয়।

কৃ+ই+আ।

শুট্‌কিয়া, (শুট্‌কে), পুঁট্‌কিয়া (পুঁট্‌কে), পুঁচ্‌কিয়া, (পুঁচ্‌কে), ফচ্‌কিয়া (ফচ্‌কে), ছোট্‌কিয়া (ছুট্‌কে)।

উক্‌।

মিথ্যুক্‌, লাজুক্‌, মিশুক্‌।

গির্‌+ই।

গির্‌ প্রত্যয়টি বাংলায় চলে নাই। তাগাদ্‌গির্‌ প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশী। কিন্তু এই গির্‌ প্রত্যয়ের সহিত ই প্রত্যয় মিশিয়া গিরি প্রত্যয় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে।

ব্যবসায় অর্থে ই প্রত্যয় সর্ব্বত্র হয় না। কামারের ব্যবসায়কে কেহ কামারি বলে না, বলে কামারগিরি। এই গির্‌+ই যোগে অধিকাংশ ব্যবসায় ব্যক্ত হয়। অ্যাটর্ণিগিরি, স্যাকরাগিরি, মুচিগিরি, মুটেগিরি।

অনুকরণ অর্থে :—বাবুগিরি, নবাবগিরি।

দার।

দোকানদার্‌, চৌকিদার্‌, রংদার্‌, বুটিদার্‌, জেল্লাদার্‌, যাচনদার্‌ চড়নদার্‌ ইত্যাদি। ইহার সহিত ই প্রত্যয় যুক্ত হইয়া দোকান-দারি ইত্যাদি বৃত্তিবাচক বিশেষ্যের সৃষ্টি হয়।

দান্‌।

বাতিদান্‌, পিকদান্‌, শামাদান্‌, আতরদান্‌। স্বার্থে ই প্রত্যয় যোগে বাতিদানি, পিকদানি, আতরদানি হইয়া থাকে।

সই।

হাতসই, মাপসই, প্রমাণসই, মানানসই, ট্যাকসই

পনা।

বুড়াপনা, ন্যাকাপনা, ছিব্‌লেপনা, গিন্নিপনা।

ওলা বা ওয়ালা।

কাপড়ওয়ালা, ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তরো।

এমনতরো, যেমনতরো, কেমনতরো।

অৎ।

মানৎ, বসৎ, ঘুরৎ, ফেরৎ, গলৎ, (গলদ্‌)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয়ে দ্রুতবেগ বুঝায়; সড়াৎ, ফুড়ৎ, পটাৎ, খটাৎ।

অৎ+আ।

ধর্‌তা, ফের্‌তা, পড়্‌তা, জান্‌তা (সবজান্তা)।

তা।

বিশিষ্ট অর্থে :—যথা পান্‌তা নোন্‌তা। তল্‌তা (তরল্‌তা, তরল বাঁশ)। আওতা, নাম্‌তা শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝা যায় না।

অৎ+ই।

ফির্‌তি, চল্‌তি, উঠ্‌তি, বাড়্‌তি, পড়্‌তি, চুক্‌তি, ঘাট্‌তি, গুন্‌তি।

অৎ+আ+ই।

খোলতাই, ধরতাই।
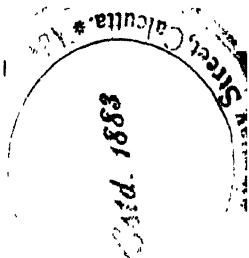
অন্ত।

জিয়ন্ত, ফুটন্ত, চলন্ত,

মন্ত।

লক্ষ্মীমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, আক্কেলমন্ত।

অন্‌দা (?)

বাসন্দা, (অধিবাসী)। মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন) বলা উচিত এ প্রত্যয়টির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই।

ট্।

চাপট্ (চৌচাপট্), সাপট্ ঝাপট্, দাপট্।

ট্+ই।

চিম্‌টি।

ট্ট।

ভরট্ট। (নদীভরট্ট, খালভরট্ট জমি)।

আ+ট।

জমাট্, ভরাট্, ঘেরাট্।

টা।

চ্যাপ্‌টা, ল্যাঙটা, ঝাপ্‌টা, ল্যাপটা, চিম্‌টা, শুক্‌টা।

আট+ই+আ।

রোগাটিয়া (রোগাটে), বোকাটিয়া (বোকাটে), তামাটিয়া, (তামাটে), ঘোলাটিয়া (ঘোলাটে), ভাড়াটিয়া, (ভাড়াটে), বামন্‌টিয়া (বেঁটে)।

অং, আং, ইং।

ভড়ং, ভুজং-ভাজাং, চোং (নল), খোলাং (খোলাং কুচি), তিড়িং। বড়াং (কোনো কোনো জেলায় অহঙ্কার অর্থে বড়াই না বলিয়া বড়াং বলে)।

অঙ্গ, অঙ্গি, অঙ্গিয়া।

সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গি, সুড়ঙ্গে, কুলঙ্গি, ধিঙ্গি, ধেড়েঙ্গে, বিরিঙ্গি (বৃহৎ পরিবারকে কোনো কোনো প্রদেশে "বিরিঙ্গি গুষ্টি" বলে।।

চ, চা, চি।

আল্‌গচ (আল্‌গা ভাব), ল্যাংচা (খোঁড়ার ভাব), ভ্যাংচা (ব্যঙ্গের ভাব)। ভাংচি, খিমচি, ঘামাচি। ত্যাড়্‌চা (তির্য্যক্ ভাব)। আধার অর্থে ঃ—ধূনচি, ধূপচি, খুঞ্চি, চিলিম্‌চি, খাতাঞ্চি, মসাল্‌চি।

ক্ষুদ্র অর্থে—ব্যাঙাচি, নলচি (হুঁকার), কঞ্চি, কুচি। মোচা (কলার মোচা ; মুকুলচা হইতে মোচা, মোচার ক্ষুদ্র মুচি)।

অস্।

খোলস্, মুখস্, তাড়স্, চ্যাপস্।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়ে স্থূলতা ও ভার বুঝায়, ধপ্ হইতে ধপাস্। ব্যাপ্তি বুঝায়, যথা, ধড়াস্ করিয়া পড়া—অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া পড়া। খট্ এবং খটাস্, পট্ এবং পটাস্ শব্দের সূক্ষ্ম অর্থভেদ নির্দ্দেশ করিতে গেলে পাঠকদের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করি।

সা।

চোপ্‌সা, গোম্‌সা, ঝাপ্‌সা, ভাপ্‌সা, চিম্‌সা, পান্‌সা, ফেন্‌সা, একসা, খোলসা, মাকড়্‌সা, কাল্‌সা।

সা+ইয়া।

ফ্যাকাসিয়া (ফ্যাকাসে)। লাল্‌চে সম্ভবতঃ লাল্‌সে কথার বিকার। কাল্‌সিটে—(কাল্+সা+ইয়া+টা=কাল্‌সিয়াটা, কাল্‌সিটে)।

আম প্রত্যয়।

অনুকরণ অর্থে :—বুড়ামো, ছেলেমো, পাগ্‌লামো, জ্যাঠামো, বাঁদ্‌রামো।

ভাব অর্থে :—মাৎলামো, ঢিলেমো, আল্‌সেমো।

আম ই।

বুড়ামি, মাৎলামি ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে ই।

ছুঁড়ি, ছুক্‌রি, বেটি, খুড়ি, মাসি, পিসি, দিদি, পাঁঠি, ভেড়ি, বুড়ি, বাম্‌নি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি।

কলুনি, তেলিনি, গয়লানি, বাঘিনি, মালিনি, ধোবানি, নাপিতনি, কামারনি, চামারনি, পুরুতনি, মেতরানি, তাঁতনি, ঠাকুরানি, চাক্‌রানি, উড়েনি, কায়েতনি, খোট্টানি, মুসলমান্‌নি, জেলেনি।

যতগুলি মনে পড়িল লিখিলাম। নিঃসন্দেহই অনেকগুলি বাদ পড়িয়াছে; সেগুলি পূরণের জন্য পাঠকদের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা প্রাদেশিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত যত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, ততই কাজে লাগিবে।

প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি নির্ণয় করাও বাকি রহিল।

প্রত্যেক প্রত্যয়জাত শব্দের তালিকা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয়ই পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন, প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায়; তাহারা কেন যে কয়টিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জ্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে। মন্ত প্রত্যয় কেনই বা "আক্কেল" শব্দকে আশ্রয় করিয়া "আক্কেলমন্ত" হইবে, অথচ "চালাকি" শব্দের সহযোগে "চালাকিমন্ত" হইতে পারিল না তাহা কে বলিবে? "নি" যোগে বহুতর বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে—কামারনি খোট্টানি ইত্যাদি। কিন্তু বদ্যিনি (বৈদ্যস্ত্রী) কেহ তো বলে না;—উড়েনি বলে, কিন্তু পাঞ্জাবিনি বা শিখিনি বা মগিনি বলে না। বাঘিনি হয়, কিন্তু উটিনি হয় না, কুকুরনি বেড়াল্‌নি হয় না। প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ অনেক স্থলে হয়ই না, সেই কারণে মাদি কুকুর বলিতে হয়। পাঁঠার স্ত্রীলিঙ্গে পাঁঠি হয়; মোষের স্ত্রীলিঙ্গে মোষি হয় না। এ সমস্ত অনুধাবন করিবার যোগ্য।

কোন্ প্রত্যয় যোগে শব্দের কী প্রকার রূপান্তর হয় তাহাও নিয়মবদ্ধ করিয়া লেখা আবশ্যক। নিতান্তই সময়াভাববশতঃ আমি সে কাজে হাত দিতে পারি নাই। নোড়া শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিলে হয় নুড়ি; দাড়ি শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় দেড়ে; টোল্

শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় টুলো; মধুশব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় মোধো; লুন্ শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় লোনা; জ্বল্ শব্দের উত্তর অন্+ই প্রত্যয় করিলে হয় জ্বলুনি, কোঁদল শব্দের উত্তর ই+আ প্রত্যয় করিলে হয় কুঁদুলে।

কতকগুলি প্রত্যয় আমি আনুমানিক ভাবে দিয়াছি। সেগুলিকে প্রত্যয় বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু শব্দ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রত্যয়রূপ প্রমাণ করিতে পারি নাই যেমন, অং প্রত্যয়। ভুজং ভড়ং প্রভৃতি শব্দের অং বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা বাংলায় চলিত নাই। ভড়্ শব্দ নাই বটে, কিন্তু ভড়্কা আছে, ভড়ং এবং ভড়কের অর্থসাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয়, ভড়্ বলিয়া একটা আদি-শব্দ ছিল, তাহার উত্তর অক্ করিয়া ভড়ক্ ও অং করিয়া ভড়ং হইয়াছে। বড়াং শব্দে এই মত সমর্থন করিবে। আমার কাল্না প্রদেশীয় বন্ধুগণ বলেন, তাঁহারা বড়াই শব্দের স্থলে বড়াং শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন, তাহাতে বুঝা যায়, বড়ো শব্দের উত্তর যেমন আ+ই প্রত্যয় করিয়া বড়াই হইয়াছে, তেমনি আং প্রত্যয় করিয়া বড়াং হইয়াছে—মূল শব্দটি বড়ো, প্রত্যয় দুইটি আই ও আং।

প্রত্যয়গুলি কী ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তাহাও বিচারের দ্বারা ক্রমশ স্থির হইতে পারিবে। যাহাকে অস্ প্রত্যয় বলিয়াছি, তাহা অস্ অথবা অ—বর্জ্জিত, সা প্রত্যয়টি স্+আ, অথবা সা, এ সমস্ত নির্ণয় করিবার ভার ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতদের উপর নিক্ষেপ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

১৩০৮

সম্বন্ধে কার।

সংস্কৃত "কৃত" এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ "কের" শব্দ হইতে বাংলা ভাষায় সম্বন্ধে "র" বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্ব্বে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে "তাহার" "যাহার"—অর্থে "তাকর" "যাকর" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখানো হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অপ্রচলিত পুরাতন দৃষ্টান্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এখনও সম্বন্ধে বাংলায় "কার" শব্দ প্রয়োগ ব্যবহৃত হয়। যথা, এখনকার তখনকার, ইত্যাদি।

কিন্তু এই "কার" শব্দের প্রয়োগ কেবল স্থল বিশেষেই বদ্ধ। "কৃত" শব্দের অপভ্রংশ "কার" কেনই বা কোনো কোনো স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা অন্যত্র কেবল মাত্র তাহার "র" অক্ষর অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না।

উচ্চারণের বিশেষ নিয়মঘটিত কারণে অনেক সময়ে বিভক্তির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথা অধিকরণে মাটির বেলায় আমরা বলি মাটিতে, ঘোড়ার বেলায় বলি ঘোড়ায়। কিন্তু এস্থলে সে কথা খাটে না। লিখন শব্দের বেলায় আমরা সম্বন্ধে বলি "লিখনের" কিন্তু এখন শব্দের বেলায় "এখনের" বলি না, বলি

"এখনকার"। অথচ "লিখন" এবং "এখন" শব্দে উচ্চারণ-নিয়মের কোনো প্রভেদ হইবার কথা নাই।

বাংলায় কোন্ কোন্ স্থলে সম্বন্ধে "কার" শব্দের প্রয়োগ হয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইল।

এখনকার, তখনকার, যখনকার, কখনকার। এখানকার, সেখানকার, যেখানকার, কোন্‌খানকার। এবেলাকার, ওবেলাকার, এসময়কার ওসময়কার, সে বছরকার, ও বছরকার, যেদিনকার, সেদিনকার, এদিক্‌কার, ওদিককার, (দক্ষিণ দিক্‌কার, উত্তর দিক্‌কার, সম্মুখ দিককার, পশ্চাৎ দিক্‌কার)

আজকেকার, কালকেকার, পর্শুকার।

এপারকার, ওপারকার, উপরকার, নিচেকার, তলাকার, কোথাকার।

এ ধারকার, ও ধারকার, সাম্‌নেকার, পিছনকার।

এ হপ্তাকার, ও হপ্তাকার।

আগেকার, পরেকার, কবেকার।

একালকার, সেকালকার।

প্রথমকার, শেষেকার, মাঝেকার।

ভিতরকার, বাহিরকার।

আগাকার, গোড়াকার।

সকালকার, বিকালকার।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় সময় এবং অবস্থান (position) সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত "কার" বিভক্তির যোগ।

কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে, তাহারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। আমরা বলি, "দিনেরবেলা" দিনকার বেলা বলি না। অথচ "সেদিনকার" শব্দ প্রচলিত আছে। "সময়" শব্দের সম্বন্ধে "সময়ের" বলি অথচ তৎপূর্ব্বে এ, সে প্রভৃতি সর্ব্বনাম যোগ করিলে সম্বন্ধে কার বিভক্তি বিকল্পে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রমাণ হয়, সময় ও দেশ সম্বন্ধে যেখানে বিশেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, সেইখানেই "কার" শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। "সেদিনের কথা" এবং "সেদিনকার কথা" এ দুটা শব্দের একটি সূক্ষ্ম অর্থভেদ আছে। "সেদিনের" অর্থ অপেক্ষাকৃত অনির্দ্দিষ্ট, সেদিনের কথা বলিতে অতীতকালের অনেক দিনের কথা বুঝাইতে পারে, কিন্তু "সেদিনকার কথা" বলিতে বিশেষ একটি দিনের কথা বুঝায়। যেখানে সেই বিশেষত্বের উপর বেশি জোর দিবার প্রয়োজন, কোনো মতে দেশ বা কালের একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবার জো নাই, সেখানে শুদ্ধমাত্র "এর" বিভক্তি না দিয়া "কার" বিভক্তি হয়।

অতএব বিশেষার্থবোধক, সময় এবং অবস্থান সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের উত্তর সম্বন্ধে "কার" প্রত্যয় হয়।

ইহার দুটি অথবা তিনটি ব্যতিক্রম চোখে পড়িতেছে। "এক-জনকার দুইজনকার" ইত্যাদি, ইহা মনুষ্য সংখ্যাবাচক। দেশকাল-বাচক নহে। মনুষ্য সমষ্টিবাচক "সকলকার" এবং "সত্যকার"। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে. "সকলকার" হয় কিন্তু সমস্তকার হয় না, (প্রাচীন বাংলায় "সভাকার") "সত্যকার" হয় কিন্তু "মিথ্যাকার"

হয় না। এবং মনুষ্য সংখ্যাবাচক "একজন" "দুইজন" ব্যতীত পশু বা জড়সংখ্যাবাচক "একটা" "দুইটা"র সহিত "কার" শব্দের সম্পর্ক নাই।

অবস্থানবাচক যে সকল শব্দে "কার" প্রত্যয় হয় তাহার অধিকাংশই বিশেষণ। যথা :—উপর, নিচ, সমুখ, পিছন, আগা, গোড়া, মধ্য, ধার, তল, দক্ষিণ, উত্তর, ভিতর ও বাহির ইত্যাদি। বিশেষ্যের মধ্যে কেবল "খান" (স্থান) "পার" ও "ধার" শব্দ। এই তিনটি বিশেষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহাদের পূর্ব্বে "এ" "সে" প্রভৃতি বিশেষার্থবোধক সর্ব্বনাম যুক্ত না হইলে ইহাদের উত্তরে "কার" প্রত্যয় হয় না। যথা সেখানকার, এপারকার, ওধারকার। কিন্তু ভিতরকার, বাহিরকার প্রভৃতি শব্দে সে কথা খাটে না।

সময়বাচক যে সকল শব্দের উত্তর "কার" প্রত্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই বিশেষ্য। যথা :—দিন, রাত্রি, ক্ষণ, বেলা, বার, বছর, হপ্তা ইত্যাদি। এইরূপ সময়বাচক বিশেষ্য শব্দের "এ" সে" প্রভৃতি সর্ব্বনাম বিশেষণ না থাকিলে তদুত্তরে "কার" প্রয়োগ হয় না। শুদ্ধমাত্র, বারকার, বেলাকার ক্ষণকার হয় না, এবেলাকার এখানকার, এক্ষণকার এবারকার হয়। বিশেষণ শব্দে অন্যরূপ।

সময়বাচক বিশেষ্য শব্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়। "মাস," "মুহূর্ত্ত," "দণ্ড," "ঘণ্টা" প্রভৃতি শব্দের সহিত "কার" শব্দের যোগ হয় না। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ সুকঠিন।

যাহা হউক দেশসম্বন্ধে একটা মোটা নিয়ম পাওয়া যায়। দেশবাচক যে সকল শব্দে সংস্কৃতে "বর্ত্তী" শব্দ হইতে পারে বাংলায়

তাহার স্থানে "কার" ব্যবহার হয়। উর্দ্ধবর্ত্তী, নিম্নবর্ত্তী, সম্মুখবর্ত্তী, পশ্চাদ্বর্ত্তী, অগ্রবর্ত্তী প্রভৃতি শব্দের স্থলে বাংলায় উপরকার, নিচেকার, সামনেকার, পিছন্‌কার, আগাকার ইত্যাদি প্রচলিত। ঋজুবর্ত্তী, বক্রবর্ত্তী, লম্ববর্ত্তী ইত্যাদি কথা সংস্কৃতে নাই, বাংলাতেও সোজাকার বাঁকাকার লম্বাকার হইতে পারে না।

১৩০৫।

বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ভুলকরা মানবধর্ম্ম, বিশেষত বাঙালির পক্ষে ইংরেজি ভাষায় ভুল করা। সেই প্রবাদের বাকি অংশে বলে, মার্জ্জনা করা দেবধর্ম্ম। কিন্তু বাঙালির ইংরেজি ভুলে ইংরেজেরা সাধারণত দেবত্ব প্রকাশ করেন না।

আমাদের ইস্কুলে-শেখা ইংরেজিতে ভুল হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে বিদ্যা পুঁথিগত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজি ভাষার ঠিক মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই জন্য অনেক খাঁটি ইংরেজের ন্যায় তাঁহারা হয়তো ব্যাকরণে ভুল করিতেও পারেন, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্ম্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এদেশে থাকিয়া যাঁহারা ইংরেজি শেখেন, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে

বাঁচাইয়াও ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না। ইংরেজগণ তাহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন।

সেইজন্য আমাদেরও বড়ো ইচ্ছা করে, যে সকল ইংরেজ এদেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া, দেশী ভাষা শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও সুযোগ পাইয়াও সে ভাষা সম্বন্ধে ভুল করেন তাঁহাদের প্রতি হাস্যরস বর্ষণ করিয়া পাণ্টাজবাবে গায়ের ঝাল মিটাই।

সন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে দুই একটা বড়ো বড়ো দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বাবু ইংরেজির আদর্শ প্রায় অশিক্ষিত দরিদ্র উমেদারদিগের দরখাস্ত হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সহিত বাংলার ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান্ জন্ বীম্‌স্ সাহেবের তুলনা হয় না। বীম্‌স্ সাহেব চেষ্টা করিয়া বাংলা শিখিয়াছেন; বাংলা দেশেই তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়বয়স যাপন করিয়াছেন; বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালি সাক্ষীর জবানবন্দী ও বাঙালি মোক্তারের আবেদন শুনিয়াছেন এবং বাঙালি সাহিত্যেরও রীতিমতো চর্চ্চা করিয়াছেন এরূপ শুনা যায়।

কেবল তাহাই নয়, বীম্‌স্ সাহেব বাংলা ভাষার এক ব্যাকরণও রচনা করিয়াছেন। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ রচনা স্পর্দ্ধার বিষয়; পেটের দায়ে দরখাস্ত রচনার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব সেই ব্যাকরণে যদি পদে পদে এমন সকল ভুল দেখা যায়, যাহা বাঙালি মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকে, তবে সেই সাহেবি অজ্ঞতাকে পরিহাস করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

কিন্তু যখন দেখি আজ পর্য্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সম্বরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যায় কেন, এ সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই ভ্রমসঙ্কুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ এই দুটোতে মিলিয়াও আমাদের দেশের কোনো লোককে এ কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। অথচ আমাদের পক্ষে অনুষ্ঠানের পথ বিদেশীর অপেক্ষা অনেক সুগম।

বীম্‌স্ সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে যে সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। অতিপরিচয়-বশত ভাষার যে সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নমাত্র উত্থাপিত হয় না, সেইগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং বিদেশীর মধ্যস্থতায় স্বভাষার সহিত যেন নবতর দৃঢ়তর পরিচয় স্থাপিত হয়।

এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলাভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইংরেজি মুদ্রিত সাহিত্যে অনেক স্থলে বানানের

সহিত উচ্চারণের সঙ্গতি নাই। ইংরেজ লেখে একরূপ, পড়ে অন্যরূপ। বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।

"ব্যয়" শব্দের "ব্য" অব্যয় শব্দের "ব্য" এবং "ব্যতীত" শব্দের "ব্য" উচ্চারণে প্রভেদ আছে ; 'লেখা' এবং 'খেলা' শব্দের একারের উচ্চারণ ভিন্নরূপ। "সস্তা" শব্দের দুই দন্ত্যসয়ের উচ্চারণ এক নহে। "শব্দ" শব্দের "শ" অক্ষরবর্ত্তী অকার এবং "দ" অক্ষরবর্ত্তী অকারে প্রভেদ আছে। এমন বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এই উচ্চারণবিকারগুলি অনেকস্থলেই নিয়মবদ্ধ, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

বীম্‌স্ বলিতেছেন বাংলা স্বরবর্ণ অ কোথাও বা ইংরেজি "not" "rock" প্রভৃতি শব্দের স্বরের মতো, কোথাও বা "bone" শব্দের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

স্থানভেদে অ স্বরের এইরূপ বিভিন্নতা বীম্‌স্ সাহেবের স্বদেশীয়গণ ধরিতে না পারিয়া বাংলা উচ্চারণকে অদ্ভুত করিয়া তোলেন। বাঙালী গরুকে গোরু উচ্চারণ করেন, ইংরাজ তাহাকে যথাপঠিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোনো বাংলা ব্যাকরণে এই সাধারণ নিয়ম লিখিত থাকিত, যে ইকার, উকার, ক্ষ এবং ণ ও ন র পূর্ব্বে প্রায় সর্ব্বত্রই অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ হইয়া যায় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গপ্রচলিত উচ্চারণের আদর্শ তাঁহাদের পক্ষে সুগম হইতে পারিত।

কিন্তু এই সকল নিয়মের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতা আছে। আমরা বন, মন, ক্ষণ প্রভৃতি শব্দকে "বোন" "মোন" "খোন" রূপে উচ্চারণ করি, কিন্তু তিন অক্ষরের শব্দের বেলায় তাহার বিপর্য্যয় দেখা যায়। তনয়, জনম, ক্ষণেক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

আশা করি বাংলার এই উচ্চারণের বৈচিত্র্য ও তাহার নিয়ম-নির্ণয়কে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন না।

বীম্‌স্ সাহেব লিখিতেছেন—সিলেব্‌লের (syllable) শেষে অ-স্বরের লোপ হইয়া হসন্ত হয়। কলসি ও ঘটকী শব্দ তিনি তাহার উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

লিখিত এবং কথিত বাংলার ব্যাকরণে প্রভেদ আছে। বীম্‌সের ব্যাকরণে কোথাও বা লিখিত বাংলার কোথাও বা কথিত বাংলার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সাধুভাষায় লিখিত সাহিত্যে আমরা ঘটকী শব্দের ট হইতে অকার লোপ করি না। অপর পক্ষে বীম্‌স্ সাহেব যে নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা, কী কথিত, কী লিখিত কোনো বাংলাতেই সর্ব্বত্র খাটে না। জনরব, বনবাস, বলবান্, পরচর্চ্চা প্রভৃতি শব্দ তাহার উদাহরণ। এস্থলে প্রথম সিলেব্‌ল্-এ সংযুক্ত অকারের লোপ হয় নাই ; অথচ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে জন, বন, বল, এবং পর শব্দের শেষ অকার লুপ্ত হইয়া থাকে। কলস দুই সিলেব্‌লে গঠিত, কল্+অস্, কিন্তু প্রথম সিলেব্‌লের পরবর্ত্তী অকারের লোপ হয় নাই। ঘটক শব্দের দুই সিলেব্‌ল্ ঘট্+অক্ এখানেও অকার উচ্চারিত হয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে চিন্তা করিয়া দেখা যায় বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়মকে আর একটু সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিলেই তাহার সার্থকতা পাওয়া যাইতে পারে।

আঁচল্‌ এবং আঁচ্‌লা, আপন এবং আপ্‌নি; চামচ এবং চাম্‌চে, আঁচড় এবং আঁচ্‌ড়ানো, ঢোলক এবং ঢল্‌কো, পরশ এবং পর্‌শু, দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী সিলেব্‌ল্‌ স্বরান্ত হইলে পূর্ব্ব সিলেব্‌লের অকার লোপ পায়, পরন্তু হসন্তের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার কিছুতেই লোপ পায় না।

কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত বনবাস জনরব বলবান প্রভৃতি শব্দে এ নিয়ম খাটে নাই। তাহাতে অকার ও আকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অ লোপ পায় নাই।

অথচ, পর্‌কলা, আল্‌পনা, অব্‌সর (লিখিত ভাষায় নহে,) প্রভৃতি প্রচলিত কথায় বীম্‌সের নিয়ম খাটে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনো রক্ষিত হয়। কিন্তু পাঠ্‌শালা প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভূষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলা ভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে।

বীমস্‌ লিখিয়াছেন বিশেষণ শব্দে সিলেবেলের অন্তবর্ত্তী ওকারের লোপ হয় না। যথা ভালো, ছোটো, বড়ো।

রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন "গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত

বিশেষণ শব্দ অকারন্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট খাট ; এতদ্‌ভিন্ন যাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্‌, পট্‌, রাম্‌, রাম্‌দাস্‌, উত্তম্‌, সুন্দর্‌, ইত্যাদি।”

রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ। যদি কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ ; তথাপি খাঁটি বাংলা শব্দেও তাহার ব্যতিক্রম মিলিবে ; যথা নরম, গরম।

একথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ-শব্দ হলন্ত নহে।

প্রথমেই মনে হয় বিশেষণ শব্দ বিশেষরূপে অকারান্ত উচ্চারিত হইবে এ নিয়মের কোনো সার্থকতা নাই ; অতএব ছোটো বড়ো ভালো প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ যে, সাধারণ বাংলা শব্দের ন্যায় হসন্ত হয় নাই, তাহার কারণটা ঐ শব্দগুলির মূল সংস্কৃত শব্দে পাওয়া যাইবে। ভালো শব্দ ভদ্র শব্দজ, বড়ো বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন, ছোটো ক্ষুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। মূল শব্দগুলির শেষবর্ণ যুক্ত,—যুক্তবর্ণের অপভ্রংশে হসন্ত বর্ণ না হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। “নৃত্য”র অপভ্রংশ নাচ, পঙ্ক—পাঁক ; অঙ্ক—আঁক ; রঙ্গ—রাং, ভট্ট—ভাট, হস্ত—হাত, পঞ্চ—পাঁচ ইত্যাদি।

অতএব নিশ্চয়ই বিশেষণের কিছু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব আরও চোখে পড়ে, যখন দেখা যায় বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ, যাহা সংস্কৃত মূল শব্দ অনুসারে অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা আকারান্ত হইয়াছে।

যথাঃ—সহজ—সোজা, মহৎ—মোটা, রুগ্ন—রোগা, ভগ্ন—ভাঙা, শ্বেত—শাদা, অভিষিক্ত—ভিজা, খঞ্জ—খোঁড়া, কাণ—কাণা, লম্ব—লম্বা, সুগন্ধ—সোঁধা, বক্র—বাঁকা, তিক্ত—তিতা, মিষ্ট—মিঠা, নগ্ন—নাগা, তির্য্যক্—টেড়া, কঠিন—কড়া।

দ্রষ্টব্য এই যে, "কর্ণ" হইতে বিশেষ্য শব্দ "কান" হইয়াছে অথচ "কান" শব্দ হইতে বিশেষণ শব্দ "কানা" হইল। বিশেষ্য শব্দ হইল "ফাঁক," বিশেষণ হইল "ফাঁকা"; "বাঁক" শব্দ বিশেষ্য, "বাঁকা" শব্দ বিশেষণ।

সংস্কৃত ভাষায় "ক্ত" প্রত্যয় যোগে যে সকল বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, বাংলায় তাহা প্রায়ই আকারান্ত বিশেষণ পদে পরিণত হয়; "ছিন্নবস্ত্র" বাংলায় "ছেঁড়া বস্ত্র," "ধূলি লিপ্ত" শব্দ বাংলায় "ধূলো লেপা," "কর্ণ কর্ত্তিত" = "কান কাটা"। ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ চন্দ্র হইতে চাঁদ, বন্ধ হইতে বাঁধ, কিন্তু বিশেষণ শব্দ মন্দ হইতে হইল "মাদা"। "এক" শব্দকে বিশেষরূপে বিশেষণে পরিণত করিলে "একা" হয়।

এইরূপ বাংলা দুই অক্ষরের বিশেষণ অধিকাংশই আকারান্ত। যেগুলি অকারান্ত, হিন্দীতে সেগুলিও আকারান্ত। যথা, ছোটা, বড়া, ভালা।

ইহার একটা কারণ আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। স্বর্গগত উমেশচন্দ্র বটব্যালের রচনা হইতে দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে নিম্নলিখিত ছত্রকয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে স্বার্থে 'ক' এর ব্যবহার কিছু বেশি। 'দূত' স্থানে 'দূতক', 'হট্ট' স্থানে 'হট্টিকা,' 'বাট' স্থানে 'বাটক' 'লিখিত' স্থানে লিখিতক' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশমধ্যেই দেখা যায়। সমুদায় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।"

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "এই 'ক' (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পত্রক) প্রাকৃতে অনেকস্থলে ব্যবহৃত দেখা যায়। গাথা ভাষায় এই 'ক' এর প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, যথা ললিতবিস্তর একবিংশাধ্যায়ে—

"সুবসন্তকে ঋতুবর আগতকে,
রতিমো প্রিয় ফুল্লিত পাদপকে॥
তবরূপ সুরূপ সুশোভনকে,
বসবর্ত্তি সুলক্ষণ চিত্রিতকে॥
বয়জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ।
সুখকারণ দেবনরাণ সুসম্ভুতিকাঃ॥
উত্থি লঘুং পরিভুঞ্জ সুযৌবনিকং।
দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকং॥

দীনেশ বাবু প্রাচীন বাংলায় এই ক প্রত্যয়ের বাহুল্য প্রমাণ করিয়াছেন।

এই ক' এর অপভ্রংশে আকার হয়। যেমন 'ঘোটক' হইতে ঘোড়া, ক্ষুদ্রক হইতে ছোঁড়া, তিলক হইতে টিকা, মধুক হইতে মহুয়া, নাবিক হইতে নাইয়া, মস্তক হইতে মাথা, পিষ্টক হইতে

পিঠা, শীষক হইতে শীষা, একক হইতে একা, চতুষ্ক হইতে চৌকা, ফলক হইতে ফলা, হীরক হইতে হীরা। ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন, লোহক হইতে লোহা, স্বর্ণক হইতে সোনা, কাংস্যক হইতে কাঁসা, তাম্রক হইতে তামা হইয়াছে।

আমরা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচক ভাবে রামকে রামা, শ্যামকে শ্যামা, মধুকে মোধো (অর্থাৎ মধুয়া) হরিকে হরে (অর্থাৎ হরিয়া) বলিয়া থাকি, তাহারও উৎপত্তি এইরূপে। অর্থাৎ রামক, শ্যামক, মধুক, হরিক শব্দ ইহার মূল। সংস্কৃতে যে হ্রস্ব অর্থে ক প্রত্যয় হয় বাংলায় উক্ত দৃষ্টান্তগুলি তাহার নিদর্শন।

দুই একস্থলে মূল শব্দের 'ক' প্রায় অবিকৃত আছে। যথা, হাল্‌কা। ইহা লঘুক শব্দজ। লহুক হইতে হলুক ও হলুক হইতে হাল্‌কা।

এই ক প্রত্যয় বিশেষণেই অধিক। এবং দুই অক্ষরের ছোটো ছোটো কথাতেই ইহার প্রয়োগ সম্ভাবনা বেশি। কারণ বড়ো কথাকে ক সংযোগে বৃহত্তর করিলে তাহা ব্যবহারের পক্ষে কঠিন হয়। এই জন্যই বাংলা দুই অক্ষরের বিশেষণ যাহা অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা অধিকাংশই আকারান্ত। যে সকল বিশেষণ শব্দ দুই অক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের ঈষৎ ভিন্নরূপ বিকৃতি হইয়াছে। যথা, পাঠক হইতে পড়ুয়া ও তাহা হইতে পোড়ো; পতিতক হইতে পড়ুয়া ও পোড়ো; মধ্যমক, মেঝুয়া, মেঝো; উচ্ছিষ্টক; এঁঠুয়া, এঁঠো, জলীয়ক, জলুয়া, জোলো; কাষ্ঠিয়ক, কাঠুয়া, কেঠো; ইত্যাদি। অনুরূপ দুই একটি বিশেষ্য পদ যাহা মনে পড়িল

তাহা লিখি। কিঙ্কিলিক শব্দ হইতে কেঁচুয়া ও কেঁচো হইয়াছে। স্বল্পাক্ষরক পেচক শব্দ হইতে পেঁচা ও বহ্বক্ষরক কিঙ্কিলিক হইতে কেঁচো শব্দের উৎপত্তি তুলনা করা যাইতে পারে। দীপরক্ষক শব্দ হইতে দেরখুয়া ও দেরখো আর একটি দৃষ্টান্ত।

বাংলা বিশেষণ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় অনেক আছে এস্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

বীম্‌স্ সাহেব বাংলা উচ্চারণের একটি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন ;—তিনি বলেন চলিত কথায় আ স্বরের পর ঈ স্বর থাকিলে সাধারণত উভয়ে সঙ্কুচিত লইয়া এ হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপে দিয়াছেন, খাইতে খেতে, পাইতে পেতে। এই সঙ্গে বলিয়াছেন in less common words অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দে এইরূপ সঙ্কোচ ঘটে না, যথা "গাইতে" হইতে "গেতে" হয় না।

গাইতে শব্দ খাইতে ও পাইতে শব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত বলিয়া কেন গণ্য হইবে বুঝা যায় না। তাহার অপরাধের মধ্যে সে একটি নিয়মবিশেষের মধ্যে ধরা দেয় না। কিন্তু তাহার সমান অপরাধী আরও মিলিবে। বাংলায় এই জাতীয় ক্রিয়াপদ যে কয়টি আছে, সবগুলি একত্র করা যাক্। খাইতে, গাইতে, চাইতে, ছাইতে, ধাইতে, পাইতে, বাইতে ও যাইতে। এই নয়টির মধ্যে কেবল, খাইতে পাইতে ও যাইতে এই তিনটি শব্দ মাত্র বীম্‌স্ সাহেবের নিয়ম পালন করে, বাকি ছয়টি অন্য নিয়মে চলে।

এই ছয়টির মধ্যে চারিটী শব্দের মাঝখানে একটা হ লুপ্ত

হইয়াছে দেখা যায়,—যথা,—গাহিতে, চাহিতে, নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে)।

হ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে। করিতে চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হইয়া কর্‌তে চল্‌তে হয়; হইতে শব্দের ইকার লোপ হইয়া হতে এবং লইতে শব্দের ইকার স্থানভ্রষ্ট হইয়া নিতে হয়। কিন্তু বহিতে, সহিতে, কহিতে শব্দের ইকার বইতে, সইতে, কইতে শব্দের মধ্যে টিঁকিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর কোনো অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।

লইতে শব্দ লভিতে শব্দ হইতে উৎপন্ন; ভ হয়ে পরিণত হইয়া লহিতে হয়। তদুৎপন্ন "নিতে" শব্দে ইকার যদিচ স্থানচ্যুত হইয়াছে তথাপি হয়ের জোরে টিকিয়া গেছে।

বীম্‌স্‌ তাঁহার উল্লিখিত নিয়মে একটা কথা বলেন নাই। তাঁহার নিয়ম দুই অক্ষরের কথায় খাটে না। হাতি শব্দে কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু হাতিয়ার শব্দের বিকারে "হেতের" হয়। "আসি" শব্দ ঠিক থাকে, "আসিয়া" হয় আস্যা, পরে হয় এসে। খাই শব্দে পরিবর্ত্তন হয় না, খাইয়া হয় খায়্যা, পরে হয় খেয়ে। এইরূপে হাঁড়িশাল হইতে হয় হেঁশেল।

এস্থলে এই নিয়মের চূড়ান্ত পর্য্যালোচনা হইল না, আমরা কেবল পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

এ স্বরবর্ণ কোথাও বা ইংরেজি come শব্দস্থিত a স্বরের মতো, কোথাও বা lack শব্দের a-র মতো উচ্চারিত হয় বীম্‌স্‌ তাহাও

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "এ" স্বরের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমরা "সাধনা" পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। বীম্‌স্ সাহেব লিখিয়াছেন যাওয়া সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ "গেল" শব্দের উচ্চারণ গ্যাল হইয়াছে, গিলিবার সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ "গেল" শব্দের উচ্চারণে বিশুদ্ধ একার রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলেন অভ্যাস ব্যতীত ইহার নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে একটি সহজ নিয়ম আছে।

যে সকল ক্রিয়াপদের আরম্ভ শব্দে ইকার আছে, যথা গিল, মিল, ইত্যাদি তাহারা ইকারের পরিবর্ত্তে একার গ্রহণ করিলে একারের উচ্চারণ বিশুদ্ধ থাকে, যথা গিলন হইতে গেলা, মিলন হইতে মেলা (মেলন শব্দ হইতে যে 'মেলার' উৎপত্তি তাহার উচ্চারণ ম্যালা), লিখন হইতে লেখা, শিক্ষণ হইতে শেখা ইত্যাদি। অন্য সর্ব্বত্রই একারের উচ্চারণ অ্যা হইয়া যায়। যথা—খেলন খেলা, ঠেলন ঠেলা, দেখন দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ গোড়ায় যেখানে ই থাকে সেটা হয় এ, গোড়ায় যেখানে এ থাকে সেটা হয় অ্যা। গোড়ায় কোথায় এ আছে এবং কোথায় ই আছে তাহা "ইতে" প্রত্যয়ের দ্বারা ধরা পড়ে। যথা, গিলিতে, মিলিতে, লিখিতে, শিখিতে, মিটিতে, পিটিতে ; অন্যত্র খেলিতে, ঠেলিতে, দেখিতে, ঠেকিতে, বেঁকিতে, মেলিতে, হেলিতে ইত্যাদি।

বীম্‌স্ লিখিয়াছেন, ও এবং য় পরে পরে আসিলে তাহার উচ্চারণ প্রায় ইংরাজি w র মতো হয়। যথা ওয়াশিল, তল্‌ওয়ার, ওয়ার্ড, রেলওয়ে ইত্যাদি। একটা জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আছে,

তাহা লক্ষ্য না করিয়া সাহেব একটি অদ্ভুত বানান করিয়াছেন, তিনি ইংরাজি will শব্দকে উয়িল্ অথবা উইল না লিখিয়া "ওয়িল" লিখিয়াছেন। ওয় সর্ব্বত্রই ইংরাজি wর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে কেবল এই ও ইকারের পূর্ব্বে উ না হইয়া যায় না। বয়ের সহিত যফলা যোগে দুই তিন রকম উচ্চারণ হয় তাহা বীম্‌স্ সাহেব ধরিয়াছেন কিন্তু দৃষ্টান্তে অদ্ভুত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "ব্যবহারে"র উচ্চারণ বেভার, "ব্যক্তি"র উচ্চারণ বিক্তি, এবং "ব্যতীত" শব্দের উচ্চারণ বিতীত।

তাহা ছাড়া, কেবল বয়ের সঙ্গে যফলা যোগেই যে উচ্চারণ বৈচিত্র্য ঘটে তাহা নহে সকল বর্ণ সম্বন্ধেই এইরূপ। "ব্যবহার" শব্দের "ব্য" এবং "ত্যক্ত" শব্দের "ত্য" উভয়েই যফলার স্থলে যফলা আকার উচ্চারণ হয়। ইকারের পূর্ব্বে যফলার উচ্চারণ "এ" হইয়া যায়, ব্যক্তি এবং ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্ত। নব্য ভব্য প্রভৃতি মধ্য বা শেষাক্ষরবর্ত্তী যফলা আশ্রয়বর্ণকে দ্বিগুণিত করে মাত্র। ইকারের পূর্ব্বে যফলা যেমন একার হইয়া যায় তেমনি "ক্ষ"-ও একার গ্রহণ করে, যেমন "ক্ষতি" শব্দকে কথিত ভাষায় "খেতি" উচ্চারণ করে। ইহার প্রধান কারণ, "ক্ষ" অক্ষরের উচ্চারণে আমরা সাধারণত যফলা যোগ করিয়া লই। এইজন্য "ক্ষমা" শব্দের ইতর উচ্চারণ "খ্যামা"।

আমরা বীম্‌স্ সাহেবের ব্যাকরণধৃত উচ্চারণ-পর্য্যায় অনুসরণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে দুইচারিটা কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এ কথা

নিশ্চিত যে, বাংলার উচ্চারণতত্ত্ব ও বর্ণ-বিকারের নিয়ম বাঙালীর দ্বারা যথোচিত আলোচিত হয় নাই।

১৩০৫

বাংলা বহুবচন।

সংস্কৃত ভাষার সাত বিভক্তি প্রাকৃতে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি নাই বলিলেই হয় এবং ষষ্ঠীর দ্বারাই প্রথমা ব্যতীত অন্য সকল বিভক্তির কার্য্য সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বাংলায় কী হয় দেখা যাক্। বাংলায় যে সকল বিভক্তিতে 'এ' যোগ হয় তাহার ইতিহাস প্রাকৃত "হি"র মধ্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত, গৃহস্থ, অপভ্রংশ প্রাকৃত, ঘরহে, বাংলা, ঘরে। সংস্কৃত তাম্রকস্থ, অপভ্রংশ প্রাকৃত, তম্বঅহে, বাংলায় তাঁবায়। (তাঁবাএ)

পরবর্ত্তী "হি" যে অপভ্রংশে একার হইয়া যায় বাংলায় তাহার অন্য প্রমাণ আছে। "বারবার" শব্দটিকে জোর দিবার সময় আমরা "বারে বারে" বলি—সংস্কৃত নিশ্চয়ার্থ সূচক "হি"—যোগে ইহা নিষ্পন্ন; বারহি বারহি = বারই বারই = বারেবারে। "একেবারে" শব্দটিরও ঐরূপ ব্যুৎপত্তি। প্রাচীন বাংলায় কর্ম্মকারকে এ বিভক্তি যোগ ছিল তাহা বাংলা কাব্য প্রয়োগ দেখিলেই বুঝা যায়। "লাজ কেন কর বধূজনে।" (কবিকঙ্কণ)

করণ কারকেও "এ" বিভক্তি চলে। যথা "পূজিলেন ভূষণে চন্দনে।" "ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ।" "তিলকে ললাট শোভিত।" বাংলায় সম্প্রদান কর্ম্মের অনুরূপ। যথা ;—"দীনে করো দান" "গুরু জনে করো নতি।"

অধিকরণের তো কথাই নাই।

যাহা হৌক সম্বন্ধের চিহ্ন লইয়া প্রায় সকল কারকের কাজ চলিয়া গেল কিন্তু স্বয়ং সম্বন্ধের বেলা কিছু গোল দেখা যায়।

বাংলায় সম্বন্ধে "র" আসিল কোথা হইতে ? পাঠকগণ বাংলা প্রাচীন কাব্যে দেখিয়া থাকিবেন তাহার যাহার প্রভৃতি শব্দের স্থলে "তাকর" "যাকর" প্রভৃতি প্রয়োগ কোথাও দেখা যায়। এই "কর" শব্দের 'ক' লোপ পাইয়া 'র' অবশিষ্ট রহিয়াছে এমন অনুমান সহজেই মনে উদয় হয়।

পশ্চিমি হিন্দির অধিকাংশ শাখায় ষষ্ঠীতে কো, কা, কে, প্রভৃতি বিভক্তি যোগ হয়। যথা ঘোড়েকা, ঘোড়েকো, ঘোড়েকৌ, ঘোড়াকো।

বাংলার সহিত যাহাদের সাদৃশ্য আছে নিম্নে বিবৃত হইল··· মৈথিলী—ঘোড়াকর, ঘোড়াকের ; মাগধী—ঘোড়াকের, ঘোড়াবাকর ; মাড়োয়ারী—ঘোড়ারো ; বাংলা ঘোড়ার।

এই তালিকা আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় "কর" শব্দ কোনোও ভাষা সমগ্র রাখিয়াছে, এবং কোনোও ভাষায় উহার "ক" অংশ কোনোও ভাষায় উহার র অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃতে অনেক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায়। যথা "কস্‌স কেরকং এদং পবহণং" কাহার এই গাড়ী। "তুম্হহং কেরউং ধনু" তোমার ধনু। "জসুকেরে হুংকারউয়েঁ মুহহুঁ পড়ংতি তনাই" যাহার হুঙ্কারে মুখ হইতে তৃণ পড়িয়া যায়। ইহার সহিত চাঁদ কবির "ভীমহকরি সেন" ভীমের সৈন্য, তুলসীদাসের "জীবহুকের কলেসা" জীবগণের ক্লেশ, তুলনা করিলে উভয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না। এই কেরক শব্দের সংস্কৃত, কৃতক, কৃত। তস্যকৃত শব্দের অর্থ তাঁহার দ্বারা কৃত। এই কৃত-বাচক সম্বন্ধ ক্রমে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ কারকেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণেই প্রমাণ হইবে।

'এই স্থলে বাংলা ষষ্ঠীর বহুবচন "দের" "দিগের" শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করা যাইতে পারে। দীনেশ বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচ্য। এ স্থলে উদ্ধৃত করি,—

"বহুবচন বুঝাইতে পূর্ব্বে শব্দের সঙ্গে শুধু "সব" "সকল" প্রভৃতি সংযুক্ত হইত। যথা ;—

"তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার। চৈ, ভা।"

ক্রমে" "আদি" সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল। যথা—নরোত্তম বিলাসে—

"শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥

শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীবাস আচার্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥"

এইরূপে "রামাদি" "জীবাদি" হইতে ষষ্ঠী "র" সংযোগে রামদের জীবদের হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়।

"আদি" শব্দের উত্তরে স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়া 'বৃক্ষাদিক' 'জীবাদিক' শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলতঃ উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা নরোত্তম বিলাসে—

রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে॥

এই 'ক' এর 'গ' এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং 'বৃক্ষাদিগ' (বৃক্ষদিগ) 'জীবাদিগ, (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর 'র' সংযোগে 'দিগের' এবং কর্ম্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত 'কে'র সংযোগে 'দিগকে' পদ উৎপন্ন হইয়াছে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।"

সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ের কথা নহে। কারণ দীনেশ বাবু কেবল অকারান্ত পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইকার উকারান্ত পদের সহিত আদি শব্দের যোগ তিনি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এবং "রামাদিগ" হইতে "রামদিগ" হওয়া যত সহজ "কপ্যাদিগ" হইতে "কপিদিগ" এবং "ধেন্বাদিগ" হইতে "ধেনুদিগ" হওয়া তত সহজ নহে।

হিন্দিভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সাধু হিন্দি—ঘোড়োঁকা। কনৌজি,—ঘোড়নকো। ব্রজভাষা, ঘোড়েঁকো অথবা ঘোড়নিকৌ। মাড়োয়ারি—ঘোড়াঁরো। মেওয়ারি—ঘোড়াঁকো। গড়ওয়ালি,—ঘোড়োঁকো। অবধি,—ঘোড়াকর। রিওয়াই,—ঘোঁড়নকর। ভোজপুরি—ঘোড়নকি। মাগধি—ঘোড়নকের। মৈথিলি—ঘোড়নিক, ঘোড়নিকর।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাইতেছে, কা, কো, কের, কর প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্নের বহুবচন নাই। বহুবচনের চিহ্ন মূল শব্দের সহিত সানুনাসিকরূপে যুক্ত।

অপভ্রংশ প্রাকৃতে ষষ্ঠীর বহুবচনে হং হুং হিং বিভক্তি হয়। সংস্কৃতে "নরাণাং কৃতকঃ" শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে "নরহং কেরও" এবং হিন্দিতে "নরেঁকো" হয়। সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং হিন্দিতে বিচিত্র সানুনাসিকে পরিণত হইয়াছে।

বাংলায় এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের মতে সম্পূর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। নিম্নে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। হিন্দিতে কর্ত্তৃকারকে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষরূপে বহুবচন বুঝাইতে হইলে লোগ্ গণ প্রভৃতি শব্দ অনুযোজন করা হয়।

প্রাচীন বাংলারও এই দশা ছিল পুরাতন কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে ;—দেখা গিয়াছে সব সকল প্রভৃতি শব্দের অনুযোজনাদ্বারা বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

কিন্তু হিন্দিতে দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন যোগের

সময় শব্দের একবচন ও বহুবচন রূপ লক্ষিত হয়। যথা ঘোড়েকো, একটি ঘোড়াকে, ঘোড়োঁকো, অনেক ঘোড়াকে। ঘোড়ে একবচন-রূপ এবং ঘোড়োঁ বহুবচনরূপ।

পূর্ব্বে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠী-বিভক্তিচিহ্ন হে, হি স্থলে বাংলায় একার দেখা যায়, যথা অপভ্রংশ প্রাকৃত ঘরহে, বাংলায় ঘরে।

হিন্দীতেও এইরূপ ঘটে। ঘোড়ে শব্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাকৃতের প্রথা অনুসারে প্রথমে গৌড়ীয় ভাষায় বিভক্তির মধ্যে ষষ্ঠীবিভক্তিচিহ্নই একমাত্র অবশিষ্ট ছিল অবশেষে ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য সেই ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত সংলগ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকজ্ঞাপক শব্দযোজনা প্রবর্ত্তিত হইল।

বাংলায় এই নিয়মের লক্ষণ একেবারে নাই তাহা নহে। হাতর না বলিয়া বাংলায় হাতের বলে, ভাইর না বলিয়া ভাইয়ের বলে, মুখতে না বলিয়া মুখেতে এবং বিকল্পে পাতে এবং পায়েতে বলা হইয়া থাকে।

প্রথমে হাতে, ভাইয়ে, মুখে, পায়ে, রূপ করিয়া তাহাতে র তে প্রভৃতি বিশেষ বিভক্তি যোগ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই একার প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবাচক হি হের অপভ্রংশ।

আমাদের বিশ্বাস বহুবচনেও বাংলা এক সময়ে হিন্দীর অনুযায়ী ছিল এবং সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং বিভক্তি যেখানে হিন্দিতে সংক্ষিপ্ত সানুনাসিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বাংলায় তাহা

"দ" আকার ধারণ করিয়াছে এবং "কৃত" শব্দের অপভ্রংশ কের তাহার সহিত বাহুল্য প্রয়োগরূপে যুক্ত হইয়াছে।

তুলসীদাসে আছে "জীবহ্নকের কলেসা" এই "জীবহ্নকের" শব্দের রূপান্তর "জীবদিগের" হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

ন হইতে দ হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত সকলেই অবগত আছেন —বানর হইতে বান্দর ও বাঁদর।

কর্ম্মকারকে "জীবহ্নকে হইতে "জীবদিগে"শব্দের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের নূতন সৃষ্ট বাংলায় আমরা কর্ম্মকারকে "দিগকে" লিখিয়া থাকি কিন্তু কথিত ভাষায় মনোযোগ দিলে কর্ম্মকারকে দিগে শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই শুনা যায়।

বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন সাধারণ লোকদের মধ্যে "আমাগের" "তোমাগের" শব্দ প্রচলিত আছে। এরূপ প্রয়োগ বাংলার কোনো বিশেষ প্রদেশে বদ্ধ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুখে বারম্বার শুনা গিয়াছে ইহা নিশ্চয়। "আমাগের" "তোমাগের" শব্দের মধ্যস্থলে দ আসিবার প্রয়োজন হয় নাই—কারণ ম সানুনাসিক বর্ণ হওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী সানুনাসিককে সহজে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। "যাগের" "তাগের" শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই।

এই মতের বিরুদ্ধে সন্দেহের একটি কারণ বর্ত্তমান আছে। আমরা সাধারণতঃ নিজদের লোকদের গাছদের না বলিয়া নিজেদের লোকেদের গাছেদের বলিয়া থাকি। জীবহ্নকের = জীবহ্নের =

জীবন্দের = জীবদের, এরূপ রূপান্তরপর্য্যায়ে উক্ত একারের স্থান কোথাও দেখি না।

মেওয়ারি কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির একটি প্রাচীন রূপ দেখা যায়, হংদো। কাশ্মীরিতে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন হিংদ। জনহিংদ বলিতে লোকদিগের বুঝায়। বীম্‌স্‌ সাহেবের মতে এই হংদো ভূধাতুর ভবন্ত হইতে উৎপন্ন। যেমন কৃত এক প্রকারের সম্বন্ধ তেমনি ভূত আর একপ্রকারের সম্বন্ধ।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় "জন হিন্দকের" "জনহিঁন্দের" শব্দের এক-পর্য্যায়গত শব্দ জনদিগের জনেদের, তাহা হইলে নিয়মে বাধে না। "ঘরহি" স্থলে যদি "ঘরে" হয় তবে "জনহি" স্থলে "জনে" হওয়া অসঙ্গত নহে। বাংলার প্রতিবেশী আসামী ভাষায় "হঁত" শব্দ বহুবচনবাচক। মানুহহঁত অর্থে মানুষগণ বুঝায়। হঁত এবং হংদ শব্দের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হংদ সম্বন্ধবাচক বহুবচন, হঁত বহুবচন কিন্তু সম্বন্ধবাচক নহে।

পরন্তু সম্বন্ধ ও বহুবচনের মধ্যে নৈকট্য আছে। একের সহিত সম্বন্ধীয়গণই বহু। বাংলায় রামের শব্দ সম্বন্ধস্থচক, "রামেরা" বহুবচনস্থচক; রামেরা বলিতে রামের গণ, অর্থাৎ রাম সম্বন্ধীয়গণ বুঝায়। নরা গজা প্রভৃতি শব্দে প্রাচীন বাংলায় বহুবচনে আকার প্রয়োগ দেখা যায়, রামের শব্দকে সেইরূপ আকার যোগে বহুবচন করিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

নেপালি ভাষায় ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যে স্থলে দেবেরা বলি তাহারা দেবহেরু বলে। হে এবং রু উভয়

শব্দই সম্বন্ধবাচক—এবং সম্বন্ধের বিভক্তি দিয়াই বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আসামি ভাষায় ইহঁতর শব্দের অর্থ ইহাদের, তঁহতর তোমাদের। ইহঁত-কের ইঁহাদিগের, তঁহত-কের তোমাদিগের, কানে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। কর্ম্মকারকেও আসামীই হঁতক বাংলা ইহাঁ-দিগের সহিত সাদৃশ্যবান।

এই হঁত শব্দ রাজপুত হংদো শব্দের ন্যায় ভবন্ত বা সন্ত শব্দা-নুসারী তাহা মনে করিবার একটা কারণ আছে। আসামিতে হঁওতা শব্দের অর্থ হওয়া।

এস্থলে একথাও স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, পশ্চিমি হিন্দির মধ্যে রাজপুত ভাষাতেই সাধারণ প্রচলিত সম্বন্ধকারক বাংলার অনুরূপ; "ঘোড়ার" শব্দের মাড়োয়ারি ও মেওয়ারি "ঘোড়ারো" বহুবচনে ঘোড়াঁরো।

পাঞ্জাবি ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন দা। স্ত্রীলিঙ্গে দী। ঘোড়াদা ঘোড়ার। যন্ত্রদীবাণী=যন্ত্রের বাণী। প্রাচীন পাঞ্জাবিতে ছিল ডা। আমাদের দিগের শব্দের "দ" কে এই পাঞ্জাবি দয়ের সহিত এক করিয়া দেখা যাইতে পারে। ঘোড়াদা—কের= ঘোড়দিগের।

বীম্‌স্ সাহেবের মতে পাঞ্জাবি এই "দা" শব্দ সংস্কৃত তন শব্দের অপভ্রংশ। তন শব্দের যোগে সংস্কৃত পুরাতন সনাতন প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি। প্রাকৃতেও ষষ্ঠীবিভক্তির পরে কের এবং তন উভয়ের ব্যবহার আছে,—হেমচন্দ্রে আছে সম্বন্ধিনঃ কেরতণৌ।

মেওয়ারি তনো, তণুঁ এবং বহুবচনে তণাঁ ব্যবহার হইয়া থাকে। তণাঁর উত্তর কের শব্দ যোগ করিলে তণাকের রূপে দিগের শব্দের মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যে অধিকাংশ স্থলে "সব" শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

এখনও বাংলায় সব শব্দের যোগ চলিত আছে। কাব্যে তাহার দৃষ্টান্ত "পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল"।

কিন্তু কথিত ভাষায় উক্তপ্রকার কাব্যপ্রয়োগের সহিত নিয়মের প্রভেদ দেখা যায়। কাব্যে আমাসব, তোমাসব, পাখীসব প্রভৃতি কথায় দেখা যাইতেছে সব শব্দই বহুবচনের একমাত্র চিহ্ন, কিন্তু কথিত ভাষায় অন্য বহুবচনবিভক্তির পরে উহা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আমরাসব, তোমরাসব, পাখীরাসব। যেন আমরা, তোমরা, পাখীরা "সব" শব্দের বিশেষণ।

মৈথিলি ভাষায় "সব" শব্দ যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের প্রাচীন কাব্যের ন্যায়। নেনাসভ অর্থে বালকেরা সব। নেনিসভ = বালিকারা সব। কিন্তু এসম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না। কারণ, মৈথিলীতে অন্য কোনো প্রকার বহুবচনবাচক বিভক্তি নাই। বাংলায় "রা" বিভক্তিযোগে বহুবচন সমস্ত গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, কেবল নেপালি "হেরু" বিভক্তির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু "রা" বিভক্তিযোগে বহুবচন কেবল সচেতন পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। আমরা বাংলায় ফলেরা পাতারা বলি না। এই

কারণেই ফলেরা সব পাতারা সব এমন প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

মৈথিলি ভাষায় ফলসভ, কথাসভ এরূপ ব্যবহারের বাধা নাই। বাংলায় আমরা এরূপ স্থলে ফলগুলাসব, পাতাগুলাসব বলিয়া থাকি।

সচেতন পদার্থ বুঝাইতে লোকগুলাসব, বানরগুলাসব বলিতেও দোষ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে "গুলা" যোগে বাংলায় সচেতন অচেতন সর্ব্বপ্রকার বহুবচনই সিদ্ধ হয়। এক্ষণে এই "গুলা" শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রাচীন কাব্যে দেখা যায় "সব" অপেক্ষা "গণ" শব্দের প্রচলন অনেক বেশি। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডী দেখিলে তাহার প্রমাণ হইবে,—অন্য বাংলা প্রাচীন কাব্য এক্ষণে লেখকের হস্তে বর্ত্তমান নাই, এইজন্য তুলনা করিবার সুযোগ হইল না।

এই গণ শব্দ হইতে গুলা হওয়াও অসম্ভব নহে। কারণ, গণ শব্দের অপভ্রংশ প্রাকৃত গণ্। জানি না ধ্বনিবিকারের নিয়মে গণ্ হইতে গল্ ও গুলো হওয়া সুসাধ্য কিনা।

এইখানে বলা আবশ্যক, উড়িয়া ও আসামির সহিত যদিচ বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ নৈকট্য আছে তথাপি বহুবচন সম্বন্ধে বাংলার সহিত তাহার মিল পাওয়া যায় না।

উড়িয়া ভাষায় "মানে" শব্দ যোগে বহুবচন হয়। ঘর একবচন ঘরমানে বহুবচন। বীম্‌স্ বলেন এই মান শব্দ পরিমাণ হইতে

উদ্ভূত,— হর্ণ্‌লে বলেন মানব হইতে প্রাচ্য হিন্দীতে মনুষ্যগণকে মনই বলে, মানে শব্দ তাহারই অনুরূপ।

হিন্দিতে কর্তৃকারক বহুবচন লোগ্‌ (লোক) শব্দযোগে সিদ্ধ হয়। ঘোড়ালোগ্‌ ঘোড়াসকল। বাংলাতেও শ্রেণীবাচক বহুবচনে লোক শব্দ ব্যবহৃত হয়,—যথা পণ্ডিতলোক, মূর্খলোক গরীবলোক, ইত্যাদি।

আসামি ভাষায় বিলাক, হঁত এবং বোর শব্দ যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে হঁত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিলাক এবং বোর শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় সুকঠিন।

যাহাই হোক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধের বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কেবল রাজপুতানি এবং নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক অনুধাবন করিলে অন্যান্য গৌড়ীয়-ভাষার সহিত বাংলার এই সকল বহুবচনরূপের যোগ পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তাহারই অনুশীলন করা গেল।

সম্বন্ধের একবচনেও অপর গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার প্রভেদ আছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কেবল মাড়োয়ারি ও মেওয়ারি "রো" বিভক্তি বাংলার "র" বিভক্তির সহিত সাদৃশ্যবান। এ কথাও বলা আবশ্যক উড়িয়া ও আসামি ভাষার সহিতও এ সম্বন্ধে বাংলার প্রভেদ নাই। অপরাপর গৌড়ীয় ভাষায় "কা" প্রভৃতি যোগে ষষ্ঠীবিভক্তি হয়।

কিন্তু একটি বিষয় বিশেষরূপ লক্ষ্য করিবার আছে।

উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ সর্ব্বনাম শব্দে একবচনে অথবা বহুবচনে প্রায় কোথাও ষষ্ঠীতে ককারের প্রয়োগ নাই—প্রায় সর্ব্বত্রই রকার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, সাধুহিন্দি একবচনে মেরা, বহুবচনে হমারা। কনৌজি, মেরো, হ্মারো। ব্রজভাষা মাড়ওয়ারি, ম্হাঁরো, ম্হাঁরো। মেওয়ারি, ম্হাঁরো, ম্হাঁবরাঁরো। অবধি, মোর, হমার। রিওয়াই, ম্হার, হম্‌হার।

মধ্যম পুরুষেও, তেরা, তুম্‌হরা ; তোর, তুমার ; ম্হার, তুমহার প্রভৃতি প্রচলিত।

কোনো কোনো ভাষায় বহুবচনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায় যথা ;—নেপালি হামেরুকো। ভোজপুরি, হমরণকে। মাগধী হমরণীকে। মৈথিলি হমরাসভকে।

অন্য গৌড়ীয় ভাষায় কেবল সর্ব্বনামের ষষ্ঠী বিভক্তিতে যে রকার বর্ত্তমান বাংলায় তাহা সর্ব্বনাম ও বিশেষ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। ইহা হইতে অনুমান করি, ককার অপেক্ষা রকার ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাচীনতর রূপ।

মৈথিলী ষষ্ঠীর বহুবচনে "হমরাসভকে" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বাংলায় কর্ত্তৃকারক বহুবচনে সব শব্দের পূর্ব্বে বহুবচনবাচক "রা" বিভক্তি বসে, যথা ছেলেরা সব। কিন্তু মৈথিলিতে শুদ্ধ "নেনা সব" বলিতেই বালকেরা সব বুঝায়। পূর্ব্বে এ কথাও বলিয়াছি এ সম্বন্ধে মৈথিলির সহিত বাংলার তুলনা হয় না, কারণ, মৈথিলিতে বাংলার ন্যায় কর্ত্তৃকারক বহুবচনের কোনো বিশেষ বিভক্তি নাই।

কিন্তু দেখা যাইতেছে সর্ব্বনাম উত্তম ও মধ্যম পুরুষে মৈথিলি কর্ত্তৃকারক বহুবচনে হমরাসভ তোহরাসভ ব্যবহার হয়,—এবং অন্যান্য কারকেও হম্‌রা সভ্‌কে তোহ্‌রাসভ্‌কে প্রভৃতি প্রচলিত।

মৈথিলি সর্ব্বনামশব্দে যে ব্যবহার, বাংলার সর্ব্বনাম ও বিশেষ্যে সর্ব্বত্রই সেই ব্যবহার।

ইহা হইতে দুই প্রকার অনুমান সঙ্গত হয়। হয়, এই হম্‌রা এককালে বাংলা ও মৈথিলি উভয় ভাষায় বহুবচনরূপ ছিল, নয় এককালে যাহা কেবল সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি ছিল বাংলায় তাহা ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া কর্ত্তৃকারক বহুবচন ও মৈথিলি ভাষায় তাহা কেবল সর্ব্বনাম শব্দের ষষ্ঠীবিভক্তিতে দাঁড়াইয়াছে।

বলা বাহুল্য আমাদের এই আলোচনাগুলি সংশয়পরিশূন্য নহে। পাঠকগণ ইহাকে অনুসন্ধানের সোপান স্বরূপে গণ্য করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্বর্ণ্‌লে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ্‌ সাহেবের হিন্দিব্যাকরণ, গ্রিয়র্স‍ন্‌ সাহেবের মৈথিলি ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

১৩০৫

ভাষার ইঙ্গিত

বাংলা ব্যাকরণের কোনোও কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলাভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনো মতেই ত্যাগ করা চলে না এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশ-ভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশ ভূষা না হইলে তাহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয়—কী আত্মীয়সভায়, কী রাজসভায়, কী পথে, মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।

কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ বরঞ্চ দেহত্যাগ করিতে রাজি হইবে তবু বস্ত্র ত্যাগ করিতে রাজি হইবে না—তবু বস্ত্র তাহার অঙ্গ নহে—এবং তাহার বস্ত্রতত্ত্ব ও অঙ্গতত্ত্ব একই তত্ত্বের অন্তর্গত নহে।

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয় কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ—তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের বাহ্য উপায়।

অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনি বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার

ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।

বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ মাত্র থাকে। এরূপ বেনামীতে বিদ্যালাভ ভাল কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামী তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে তিনি পণ্ডিত সমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই।

এই যে বাংলায় আমরা কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি—ইহাকে, বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যে বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে —বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।

সেই ভেদগুলি ঠিক হইয়া গেলে, ঐক্যগুলি কী বাহির করা

সহজ হইয়া পড়ে। বাংলা দেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলা ভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক, ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।

ভাষার অমুক ব্যবহার বাংলার পশ্চিমে আছে পূর্ব্বে নাই, বা পূর্ব্বে আছে পশ্চিমে নাই এরূপ একটা ঝগড়া যেন না ওঠে। এই সংগ্রহে বাংলার সকল প্রদেশকেই আহ্বান করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলা ভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা কেবলমাত্র ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না—আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাতমুখের ভঙ্গী থাকে—এমনি করিয়া কাজ চালাইতে হয়। কতকটা অর্থ এবং কতকটা ইঙ্গিতের উপরে আমরা নির্ভর করি।

আবার আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইসারা স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই ইঙ্গিত বাক্যগুলি অভিধান

ব্যাকরণের বাহিরে বাস করে কিন্তু কাজের বেলা ইহাদিগকে নইলে চলে না।

বাংলা ভাষায় এই ইঙ্গিত বাক্যের ব্যবহার যত বেশি এমন আর কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।

যে সকল শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জক, কোনো অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে। যেমন ধাঁ, সাঁ, চট্, খট্, ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনির অনুকরণমূলক শব্দ অন্য ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়—কিন্তু বাংলার বিশেষত্ব এই যে এগুলি সকল সময় বাস্তবধ্বনির অনুকরণ নহে অনেক সময়ে ধ্বনির কল্পনা মাত্র। মাথা দব্‌দব্‌ করিতেছে, টন্‌টন্‌ করিতেছে, কন্‌কন্‌ করিতেছে প্রভৃতি শব্দে বেদনা বোধকে কাল্পনিক ধ্বনির ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। "মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, শূন্য ঘর গম্‌গম্‌ করিতেছে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করিতেছে," এগুলিকে অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বিস্তারিত করিয়া বলিতে হয়—এবং বিস্তারিত করিয়া বলিলেও ইহার অনির্ব্বচনীয়তাটুকু হৃদয়ের মধ্যে তেমন অনুভবগম্য হয় না—এরূপ স্থলে এই প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ভাষাই ভাবব্যক্ত করিবার পক্ষে বেশি উপযোগী। একটা জিনিষকে লাল বলিলে তাহার বস্তুগণ সম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা খবর দেওয়া হয়। কিন্তু "লাল টুক্‌টুক্‌ করিতেছে" বলিলে সেই লাল রং আমাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছে তাহাই একটা অর্থহীন কাল্পনিক ধ্বনির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়। ইহা ইঙ্গিত—ইহা বোবার ভাষা।

বাংলাভাষায় এইরূপ অনির্ব্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় এই প্রকারের অব্যক্ত ধ্বনিমূলকশব্দ প্রচুররূপে ব্যবহার করা হয়।

ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রং লইয়া বসিলে চলে না, নানা রকমের মিশ্র রং সূক্ষ্ম রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন—Walk, run, hobble, waggle, wade, creep, crawl ইত্যাদি—বাংলা লিখিত ভাষায় কেবল দ্রুতগতি ও মন্দগতি দ্বারা এই সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু কথিত ভাষা লিখিত ভাষার মতো বাবু নহে, তাহাকে যেমন করিয়া হোক প্রতিদিনের নানান্ কাজ চালাইতে হয়—যতক্ষণ বোপদেব পাণিনি অমরকোষ ও শব্দকল্পদ্রুম আসিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া না দেন ততক্ষণ কাত হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহার চলে না—তাই সে নিজের বর্ণনার ভাষা নিজে বানাইয়া লইয়াছে। তাই তাহাকে কখনো সাঁ করিয়া, কখনো গট্‌গট্ করিয়া, কখনো খুটুস্ খুটুস্ করিয়া, কখনো নড়বড় করিতে করিতে, কখনো সুড়সুড় করিয়া, কখনো থপ্‌থপ্ এবং কখনো থপাস্ থপাস্ করিয়া চলিতে হয়। ইংরাজি ভাষা laugh, smile, grin, simper, chuckle করিয়া নানাবিধ আনন্দ কৌতুক ও বিদ্রূপ প্রকাশ করে—বাংলা ভাষা খলখল করিয়া, খিলখিল করিয়া, হোহো করিয়া, হিহি করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া, ফিক্ করিয়া এবং মুচ্‌কিয়া হাসে। মুচ্‌কে হাসির জন্য বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচ্‌কান

শব্দের অর্থ বাঁকানো—বাঁকাইতে গেলে যে মচ্‌ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি। উহাতে হাসিকে ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া মচ্‌কাইয়া রাখিলে তাহা মুচ্‌কে হাসিরূপে একটু বাঁকাভাবে বিরাজ করে।

বাংলাভাষার এই শব্দগুলি প্রায়ই জোড়াশব্দ। এগুলি জোড়াশব্দ হইবার কারণ আছে। জোড়াশব্দে একটা কাল-ব্যাপকত্বের ভাব আছে। ধূধূ করিতেছে, ধবধব করিতেছে বলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ক্রিয়ার ব্যাপকত্ব বোঝায়। যেখানে ক্ষণিকতা বোঝায় সেখানে জোড়া কথার চল্‌ নাই। যেমন ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া ইত্যাদি।

যখন "ধাঁ ধাঁ", "সাঁ সাঁ" বলা যায় তখন ক্রিয়ার পুনরাবর্ত্তন বুঝায়।

"এ" প্রত্যয় যোগ করিয়া এই জাতীয় শব্দগুলি হইতে বিশেষণ তৈরি হইয়া থাকে। যেমন ধব্‌ধবে, টক্‌টকে ইত্যাদি।

টকটক ঠকঠক প্রভৃতি কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাঝখানে আকার যোগ করিয়া উহার মধ্যে একটুখানি অর্থের বিশেষত্ব ঘটান হইয়া থাকে। যেমন, কচাকচ, কটাকট, কড়াক্কড়, কপাকপ, খচাখচ, খটাখট, খপাখপ, গপাগপ, ঝনাজ্‌ঝন, টকাটক, টপাটপ, ঠকাঠক, ধড়াধ্বড়, ধপাধপ, ধমাধ্বম, পটাপট, ফসাফস।

কপ কপ এবং কপাকপ, ফসফস এবং ফসাফস, টপটপ এবং টপাটপ শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র আকার যোগে অর্থের যে সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য হইয়াছে তাহা কোনো বিদেশীকে অর্থবিশিষ্ট ভাষার

সাহায্যে বোঝানো শক্ত। ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় যে, একবার ঠক্ করিয়া তাহার পরে বল সঞ্চয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্বিতীয়বার ঠক্ করা—মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকারযোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এইরূপে বাংলা ভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া সুরের মতো ব্যবহার করিয়াছে। সে সুর যাহার কানে অভ্যস্ত হইয়াছে সে-ই তাহার সূক্ষ্মতম মর্ম্মটুকু বুঝিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় আর একটি আছে। আদ্যক্ষরে যেখানে অকার আছে সেইখানে পরবর্ত্তী অক্ষরে আকার যোজন চলে অন্যত্র নহে।

যেমন টকটক হইতে টকাটক হইয়াছে, কিন্তু টিকটিক হইতে টিকাটিক বা ঠুকঠুক হইতে ঠুকাঠুক হয় না। এইরূপে মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে বাংলা ভাষার উচ্চারণে স্বরবর্ণগুলির কতকগুলি কঠিন বিধি আছে।

স্বরবর্ণ আকারকে আবার আর-এক জায়গায় প্রয়োগ করিলে আর এক রকমের সুর বাহির হয়। তাহার দৃষ্টান্ত :—টুকটাক, ঠুকঠাক, খুটখাট, ভুটভাট, দুড়দাড়, কুপকাপ, গুপগাপ, ঝুপঝাপ, টুপটাপ, ধুপধাপ, হুপহাপ, দুমদাম, ধুমধাম, ফুসফাস্, হুসহাস।

এই শব্দগুলি দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে—একটি অস্ফুট আর একটি স্ফুট। যখন বলি টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে—ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো, আর

একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।

আমরা এতক্ষণ যে সকল জোড়া কথার দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম তাহারা ধ্বন্যাত্মক। আর এক রকমের জোড়া কথা আছে তাহার মূল শব্দটি অর্থসূচক এবং দোসর শব্দটি মূল শব্দেরই অর্থহীন বিকার। যেমন চুপচাপ ঘুষঘাষ, তুকতাক ইত্যাদি। চুপ, ঘুষ এবং তুক এ তিনটে শব্দ আভিধানিক—ইহারা অর্থহীন ধ্বনি নহে—ইহাদের সঙ্গে "চাপ" "ঘাষ" ও "তাক এই তিনটে অর্থহীন শব্দ শুদ্ধমাত্র ইঙ্গিতের কাজ করিতেছে।

জলের ধারেই যে গাছটা দাঁড়াইয়া আছে সেই গাছটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংলগ্ন বিকৃত ছায়াটাকে একত্র করিয়া দেখিলে যেমন হয়, বাংলা ভাষার এই কথাগুলাও সেইরূপ; চুপ কথাটার সঙ্গে তাহার একটা বিকৃত ছায়া যোগ কবিয়া দিয়া চুপচাপ হইয়া গেল। ইহাতে অর্থেরও একটু অনির্দ্দিষ্টভাবের বিস্তৃতি হইল। যদি বলা যায় কেহ চুপ করিয়া আছে তবে বুঝায় সে নিঃশব্দ হইয়া আছে—কিন্তু যদি বলি চুপচাপ আছে তবে বুঝায় লোকটা কেবলমাত্র নিঃশব্দ নহে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াও আছে। একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দ্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়া কথার কাজ।

ছায়াটা আসল জিনিষের চেয়ে বড়োই হইয়া থাকে। অনির্দ্দিষ্টটা নির্দ্দিষ্টের চেয়ে অনেক মস্ত। আকার স্বরটাই বাংলায় বড়োত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে। আকার স্বরবর্ণের যোগে ঘুষঘাষের ঘাষ,

তুকতাকের তাক. ঘুষ অর্থও তুক্ অর্থকে কল্পনাক্ষেত্রে অনেকখানি বাড়াইয়া দিল অথচ স্পষ্ট কিছুই বলিল না।

কিন্তু যেখানে মূল শব্দে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে এ নিয়ম খাটে না, পুনর্ব্বার আকার যোগ করিলে কথাটা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বিগুণিত করিলে তাহার অর্থ অন্য রকম হইয়া যায়। যদি বলি গোলগোল, তাহাতে, হয়, একাধিক গোল পদার্থকে বুঝায়, নয়, প্রায়-গোল জিনিষকে বুঝায়। কিন্তু গোলগাল বলিলে গোল আকৃতি বুঝায় সেই সঙ্গেই পরিপুষ্টতা প্রভৃতি আরো কিছু অনির্দ্দিষ্ট ভাব মনে আনিয়া দেয়।

এই জন্য এইপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট ব্যঞ্জনার স্থলে দ্বিগুণিত করা চলে না, বিকৃতির প্রয়োজন। তাই গোড়ায় যেখানে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে অন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন। তাহার দৃষ্টান্ত :—

দাগদোগ, ডাকডোক, বাছবোছ, সাজসোজ, ছাঁটছোঁট, চালচোল, ধারধোর, সাফসোফ।

অন্যরকমঃ—কাটাকোটা, খাটাখোটা, ডাকাডোকা, ঢাকা-ঢোকা, ঘ্যাঁটাঘোঁটা, ছাঁটাছোঁটা, ঝাড়াঝোড়া, চাপাচোপা, ঠাসা-ঠোসা, কালোকোলো।

এইগুলির রূপান্তর :—কাটাকুটি, ডাকাডুকি, ঢাকাঢুকি, ঘাঁটাঘুঁটি, ছাঁটাছুটি, কাড়াকুড়ি, ছাড়াছুড়ি, ঝাড়াঝুড়ি, ভাজাভুজি, তাড়াতুড়ি, টানাটুনি, চাপাচুপি, ঠাসাঠুসি। এইগুলি ক্রিয়াপদ হইতে উৎপন্ন। বিশেষ্যপদ হইতে উৎপন্ন শব্দ :—কাঁটাকুঁটি, ঠাট্টাঠুট্টি, ধাক্কাধুক্কি।

শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে আকার ও পরে ইকার থাকিলে মাঝখানের ওকারটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য উকাররূপ ধরে। শুদ্ধমাত্র "কোটি" উচ্চারণ সহজ, কিন্তু "কোটাকোটি" দ্রুত উচ্চারণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। চাপাচোপি ডাকাডোকি ঘাঁটাঘোঁটি উচ্চারণের চেষ্টা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে—অথচ চুপি, ডুকি, ঘুঁটি উচ্চারণ কঠিন নহে।

তাহা হইলে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, জোড়া কথা-গুলির প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে যেখানে ই, উ, বা, ও আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে আকার স্বর যুক্ত হয়—যেমন, ঠিকঠাক, মিটমাট, ফিটফাট, ভিড়ভাড়, ঢিলেঢালা, ঢিপঢাপ ইত্যাদি। কুচোকাচা, গুঁড়োগাঁড়া, গুঁতোগাঁতা, কুটোকাটা, ফুটোফাটা, ভুজংভাজাং, টুক্‌রোটাক্‌রা, হুকুমহাকাম, শুক্‌নোশাক্‌না।—গোলগাল, যোগযাগ, সোরসার, রোখরাখ খোঁচখাঁচ গোছগাছ, মোটমাট, খোপখাপ, খোলাখালা, জোগাড়জাগাড়।

কিন্তু যেখানে প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে আকার যুক্ত আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে ওকার জুড়িতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—"জোগাড় শব্দের বেলায় হইল জোগাড়জাগাড় ডাগর শব্দের বেলায় হইল ডাগরডোগর। একদিকে দেখো, টুক্‌রো-টাকরা, হুকুমহাকাম,—অন্যদিকে হাপুস্‌হুপুস্, নাদুসনুদুস। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আকারে ওকারে একটা বোঝাপাড়া আছে। ফিরিঙ্গি যেমন ইংরাজের চালে চলে, আমাদের সঙ্কর জাতীয়

অ্যাকারও এখানে আকারের নিয়ম রক্ষা করেন যথা :—ঠ্যাকা-ঠোকা, গ্যাঁটাগোটা, অ্যালাগোলা।

উল্লিখিত নিয়মটি বিশেষ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই খাটে—অর্থাৎ যে সকল কথায় প্রথমার্দ্ধের অর্থ নির্দ্দিষ্ট ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ অনির্দ্দিষ্ট। যেমন ঘুষোঘাষা। কিন্তু "ঘুষোঘুষি" কথাটার ভাব অন্য রকম—তাহার অর্থ দুই পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ঘুষি চালাচালি। ইহার মধ্যে আভাস ইঙ্গিত কিছুই নাই। এখানে দ্বিতীয়াংশের আদ্যক্ষরে সেইজন্য স্বরবিকার হয় নাই।

এইরূপ "ঘুষোঘুষি" দলের কথাগুলি সাধারণতঃ অন্যোন্যতা বুঝাইয়া থাকে—"কানাকানি"র মানে, এর কানে ও বলিতেছে ওর কানে এ বলিতেছে। গলাগলি বলিলে বুঝায় এর গলা ও, ওর গলা এ ধরিয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের তালিকা এই খানেই দেওয়া যাক :—কষাকষি, কচলাকচলি, গড়াগড়ি, গলাগলি, চটাচটি, চট্‌কাচট্‌কি, ছড়াছড়ি, জড়াজড়ি, টক্করাটক্করি, ডলাডলি ঢলাঢলি, দলাদলি, ধরাধরি, ধস্তাধস্তি বকাবকি, বলাবলি।

আঁটাআঁটি, আঁচাআঁচি, আড়াআড়ি, আধাআধি, কাছাকাছি, কাটাকাটি, ঘাঁটাঘাঁটি, চাটাচাটি চাপাচাপি, চালাচালি, চাওয়া-চাওয়ি, ছাড়াছাড়ি, জানাজানি, জাপ্‌টাজাপ্‌টি, টানাটানি, ডাকা-ডাকি, ঢাকাঢাকি, তাড়াতাড়ি, দাপাদাপি, ধাক্কাধাক্কি, নাচানাচি, নাড়ানাড়ি, পাল্টপাল্টি, পাকাপাকি, পাড়াপাড়ি, পাশাপাশি, ফাটাফাটি, মাখামাখি, মাঝামাঝি, মাতামাতি, মারামারি, বাছা-বাছি, বাঁধাবাঁধি, বাড়াবাড়ি, ভাগাভাগি, রাগারাগি, রাতারাতি,

লাগালাগি, লাঠালাঠি, লাথালাথি, লাফালাফি, সাম্‌নাসাম্‌নি, হাঁকাহাঁকি, হাঁটাহাঁটি, হাতাহাতি, হানাহানি, হারাহারি। (হারাহারি ভাগ করা) খ্যাঁচাখেঁচি, খ্যাম্‌চাখেম্‌চি, ঘ্যাঁষাঘেঁষি, ঠ্যাসাঠেসি, ঠ্যালাঠেলি, ঠ্যাকাঠেকি, ঠ্যাঙাঠেঙি, দ্যাখাদেখি, ব্যাঁকাবেঁকি, হ্যাঁচকাহেঁচকি, ল্যাপালেপি।

কিলোকিলি, পিঠেপিঠি, (ভাইবোন)।

খুনোখুনি, গুঁতোগুতি, ঘুষোঘুষি, চুলোচুলি, ছুটোছুটি, ঝুলোঝুলি, মুখোমুখি, স্থমুখোস্থমুখি।

টেপাটিপি, পেটাপিটি, লেখালিখি, ছেঁড়াছিঁড়ি।

কোণাকুণি, কোলাকুলি, কোস্তাকুস্তি, খোঁচাখুঁচি, খোঁজা-খুঁজি, খোলাখুলি, গোড়াগুড়ি, ঘোরাঘুরি, ছোঁড়াছুঁড়ি, ছোঁওয়া-ছুঁয়ি, কোলাকুলি, ঠোকাঠোকি, ঠোক্‌রাঠুক্‌রি, দোলাদুলি, ঘোকাঘুকি, রোখারুখি, লোফালুফি, শোঁকাশুঁকি, দৌড়োদৌড়ি।

এই শ্রেণীর জোড়া কথা তৈরির নিয়মে দেখা যাইতেছে— প্রথমার্দ্ধের শেষে আ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে ই যোগ করিতে হয়। যেমন, ছাড়্ ধাতুর উত্তরে একবার আ ও একবার ই যোগ করিয়া ছাড়াছাড়ি, বল ধাতুর উত্তরে আ এবং ই যোগ করিয়া বলাবলি ইত্যাদি।

কেবল ক্রিয়াপদের ধাতু নহে, বিশেষ্য শব্দের উত্তরেও এই নিয়ম খাটে, যেমন রাতারাতি, হাতাহাতি, মাঝামাঝি ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে সেখানে

আ প্রত্যয়কে তাহার বন্ধু ওকারের শরণাপন্ন হইতে হয়। যেমন কিলোকিলি, খুনোখুনি, দৌড়োদৌড়ি।

ইহাতে প্রমাণ হয় ইকার ও উকারের পরে আকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত আছে—যথা যেখানে লিখিত ভাষায় লিখি—"মিলাই, মিশাই, বিলাই", সেখানে কথিত ভাষায় উচ্চারণ করি, "মিলোই, মিশোই, বিলোই"—"ডিবা"কে বলি ডিবে, "চিনাবাসন"কে বলি "চিনে বাসন"।"ডুবাই""লুকাই" "জুড়াই"কে বলি "ডুবোই" "লুকোই" জুড়োই", "কুলা"কে বলি "কুলো," ধূলা"কে বলি ধূলো ইত্যাদি। অতএব এখানে নিয়মের যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহা উচ্চারণ বিধিবশতঃ।

যেখানে আদ্যক্ষরে অ্যাকার, একার বা ওকার আছে সেখানে আবার আর একদিকে স্বরব্যত্যয় ঘটে—নিয়মমতো "ঠ্যালাঠ্যালি" না হইয়া ঠ্যালাঠেলি "টিপাটেপি" না হইয়া "টেপাটিপি" এবং "কোণাকোণি" না হইয়া "কোণাকুণি" হয়।

কিন্তু "শেষাশেষি" "দ্বেষাদ্বেষি" "রেষারেষি" "মেশামেশি" প্রভৃতি শ-ওয়ালা কথায় একারের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বাংলা উচ্চারণ বিধির এই সকল রহস্য আলোচনার বিষয়।

আমরা শেষোক্ত তালিকাটিকে বাংলার ইঙ্গিত বাক্যের মধ্যে ভুক্ত করিলাম কেন তাহা বলা আবশ্যক।—"কানাকানি করিতেছে" বা "বলাবলি করিতেছে" বলিলে যে সকল কথা উহ্য থাকে তাহা কেবল কথার ভঙ্গীতে ব্যক্ত হইতেছে। "পরস্পর পরস্পরের কানে কথা বলিতেছে" বলিলে প্রকৃত ব্যাপারটাকে অর্থবিশিষ্ট কথায়

ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু "কান" কথাটাকে দুইবার বাঁকাইয়া বলিয়া একটা ইঙ্গিতে সমস্তটা সংক্ষেপে সারিয়া দেওয়া হইল।

এপর্য্যন্ত আমরা তিন রকমের ইঙ্গিতবাক্য পাইলাম। একটা ধ্বনিমূলক, যেমন সোঁ সোঁ, কন্‌কন্ ইত্যাদি। আর একটা, পদবিকার-মূলক যেমন খোলাখালা, গোলগাল চুপচাপ ইত্যাদি। আর একটা পদদ্বৈতমূলক, যেমন বলাবলি ইত্যাদি।

ধ্বনিমূলক শব্দগুলি দুই রকমের। একটা ধ্বনিদ্বৈত, আর একটা ধ্বনিদ্বৈধ ;—ধ্বনিদ্বৈত, যেমন কলকল, কটকট ইত্যাদি ; ধ্বনিদ্বৈধ যেমন ফুটফাট, কুপকাপ ইত্যাদি। ধ্বনিমূলক এই শব্দগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতি প্রকাশ করে।

পদবিকারমূলক শব্দগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে অনির্দ্দিষ্ট আভাসটুকু ফিকা করিয়া লেপিয়া দেয়। পদদ্বৈতমূলক শব্দগুলি, সাধারণত অন্যোন্যতা প্রকাশ করে।

ধ্বনিদ্বৈধ ও পদবিকারমূলক শব্দগুলিতে আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল স্বরবিকারেরই পরিচয় পাইয়াছি যেমন হুস্ হাস্—হুসের সহিত যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছে তাহা স্বরবর্ণভেদ—খোলাখালা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এবারে ব্যঞ্জনবর্ণ বিকারের দৃষ্টান্ত লইয়া পড়িব।

প্রথমে অর্থহীন শব্দমূলক কথাগুলি দেখা যাক্, যেমন, উস্‌খুস্, উস্কো খুস্কো, নজ্‌গজ্, নিশ্‌পিশ্, আইঢাই, কাচুমাচু, আবলতাবল, হাঁসফাঁস, খুঁটিনাটি, আগড়ম-বাগড়ম, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, ছট্‌ফট্,

তড়বড়, হিজিবিজি, ফষ্টিনাষ্টি, আঁকুবাঁকু, হাব্জাগোব্জা, লটুখটে তড়্বড়ে ইত্যাদি।

এই কথাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দ্দিষ্টভাব প্রকাশ করে। হাত পা চোখ মুখ কাপড়চোপড লইয়া ছোটখাটো কত কী করাকে যে উস্‌খুস্‌ করা বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হতাশ হইতে হয়, কী কী বিশেষ কার্য্য করাকে যে আইঢাই করা বলে তাহা আমাদের মধ্যে কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারেন? কাঁচুমাচু করা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু কাঁচু-মাচু করার প্রক্রিয়াটি যে কী তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবার ভার লইতে পারি না।

এ তো গেল অর্থহীন কথা—কিন্তু যে জোড়া কথার প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়াংশ বিকৃতি, বাংলায় তাহার প্রধান কর্ণধার ট ব্যঞ্জনবর্ণটি। ইনি একেবারে সরকারীভাবে নিযুক্ত—জলটল, কথাটথা, গিয়েটিয়ে, কালোটালো, ইত্যাদি বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া কোথাও ইহার অনধিকার নাই। অভিধানে দেখা যায় ট অক্ষরের কথা বড়ো বেশি নাই কিন্তু বেকার ব্যক্তিকে যেমন পৃথিবী সুদ্ধ লোকের ব্যাগার ঠেলিয়া বেড়াইতে হয় তেমনি বাংলা ভাষায় কুঁড়েমি চর্চ্চার যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই ট-টাকে হাজ্‌রে দিতে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূলশব্দের বিকৃতিটাকে মূলের পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া বাংলা ভাষা একটা স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে অনেকখানি ঝাপ্‌সা অর্থ ইসারায় সারিয়া দেয়—জলটল গানটান তাহার দৃষ্টান্ত।

এই সরকারি টয়ের পরিবর্ত্তে এক এক সময় ফ একটিনি করিতে আসে, কিন্তু তাহাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে—যদি বলি লুচিটুচি, তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিম্‌কি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই—কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্ক মাত্র থাকে না।

আর দুটি অক্ষর আছে, স এবং ম। বিশেষভাবে কেবল কয়েকটি শব্দেই ইহাদের প্রয়োগ হয়।

স-এর দৃষ্টান্ত :—জো-সো, জড়োসড়ো, মোটাসোটা, রকমসকম, ব্যামোস্যামো, ব্যারামস্যারাম, বোকাসোকা, নরমসরম, বুড়োসুড়ো, আঁটসাঁট, গুটিয়েসুটিয়ে, বুঝেসুঝে।

ম-এর দৃষ্টান্ত :—চটেমটে, রেগেমেগে, হিঁচ্‌কেমিচ্‌কে, সিট্‌কে-মিট্‌কে, চট্‌কেমট্‌কে, চম্‌কেমম্‌কে, চেঁচিয়েমেচিয়ে, আঁৎকেমাৎকে, জড়িয়েমড়িয়ে, আঁচড়েমাচড়ে, শুকিয়েমুকিয়ে, কুঁচ্‌কেমুচ্‌কে, তেড়ে মেড়ে, এলোমেলো, খিটিমিটি, হুড়মুড়, ঝাঁকড়ামাকড়া, কটোমটো।

দেখা যাইতেছে ম-এর দৃষ্টান্তগুলি বেশ সাধু শান্তভাবের নহে—কিছু রুক্ষ রকমের। বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে সচরাচর কথাতেও আমরা ম অক্ষরটাকে টয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করি, অন্ততঃ ব্যবহার করিলে কানে লাগে না—কিন্তু সে সকল জায়গায় ম আপনার মেজাজটুকু প্রকাশ করে—আমরা “বিষ-মিষ” বলিতে পারি কিন্তু “সন্দেশমন্দেশ” যদি বলি তবে সন্দেশের গৌরবটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। “দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে” এ কথা বলা চলে, কিন্তু “বন্ধুকে যত্নমত্ন”

বা "গরিবকে দানমান করা উচিত" এ একেবারে অচল—হিংসে-মিংসে করা যায় কিন্তু ভক্তিমক্তি করা যায় না, তেমন তেমন স্থলে খোঁচামোচা দেওয়া যায় কিন্তু আদরমাদর নিষিদ্ধ। অতএব টয়ের ন্যায় ফ ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নহে—ইহা নিশ্চয়।

তারপরে, কতকগুলি বিশেষ কথার বিশেষ বিকৃতি প্রচলিত আছে। সেগুলি সেই কথারই সম্পত্তি। যেমন:—পড়েহড়ে, বেছেগুছে, মিলেজুলে, খেয়েদেয়ে, মিশেগুশে, সেজেগুজে, মেখেচুখে জুটেপুটে, লুটেপুটে, চুকেবুকে, বকেঝকে। এইগুলি বিশেষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত তালিকাটি ক্রিয়াপদের। এখানে বিশেষ্য পদেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে:—কাপড়চোপড়, আশপাশ, বাসন-কোসন, রসকস, রাবদাব, গিন্নিবান্নি, তাড়াহুড়ো, চোটপাট, চাকরবাকর, হাঁড়িকুঁড়ি, * ফাঁকিজুকি, জাঁকজোক, এলাগোলা, এলোথেলো, বেঁটেখেটে, খাবারদাবার, ছুতোনাতা, চাষাভূষো, † অন্ধিসন্ধি, অলিগলি, হাবুডুবু, নড়বড়, হুলস্থূল।

এই দৃষ্টান্তগুলির গুটিকয়েক কথার একটা উল্টাপাল্টা দেখা

* সংস্কৃত ভাষায় কুণ্ডীশব্দের অর্থ পাত্রবিশেষ, সম্ভবতঃ ইহা হইতে হাঁড়ি-কুঁড়ি শব্দের কুঁড়ি উৎপন্ন—এই সকল তালিকার মধ্যে এমন আরো থাকিতে পারে যে স্থলে এই দোসর শব্দগুলিকে অর্থহীনের কোঠায় ফেলা চলিবে না।

† "ছুতোনাতা" শব্দে "ছুতা" কী নিয়ম অনুসারে ছুতো হইয়াছে, এবং "চাষা ভূষো" শব্দের "ভূষা" কী কারণে "ভূষো" হইল পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি।

যায়—বিকৃতিটা আগে এবং মূলশব্দটা পরে যেমন :—আশপাশ অন্ধিসন্ধি, অলিগলি, হাবুডুবু, হুলস্থূল।

উল্লিখিত তালিকার প্রথমার্দ্ধের শেষ অক্ষরের সহিত শেষার্দ্ধের শেষ অক্ষরের মিল পাওয়া যায়। কতকগুলি কথা আছে যেখানে সে মিলটুকুও নাই। যেমন, দৌড়ধাপ, পুঁজিপাটা, কান্নাকাটি, তিতিবিরক্ত।

এইবার আমরা ক্রমে ক্রমে একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিতেছি যেখানে জোড়াশব্দের দুইটি অংশই অর্থবিশিষ্ট। সেস্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাকে সমাসের কোঠায় ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে তাহা সম্ভবপর নহে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বোঝানো যাক্।—ছাইভস্ম, কালিকিষ্টি, লজ্জাসরম প্রভৃতি জোড়া-কথার দুই অংশের একই অর্থ—এ কেবল জোর দেবার জন্য কথা-গুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। এইরূপ সম্পূর্ণ সমার্থক বা প্রায় সমার্থক জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেল।

চিঠিপত্র, লোকজন, ব্যবসাবাণিজ্য, দুঃখধান্দা, ছাইপাঁশ, ছাইভস্ম, মাথামুণ্ডু, কাজকর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, ছোটোখাটো, ছেলেপুলে, ছেলেছোকরা, খড়কুটো, সাদাসিধে, জাঁকজমক, বসবাস, সাফ-সুৎরো, ত্যাড়াবাঁকা, পাহাড়পর্ব্বত, মাপজোখ, সাজসজ্জা, লজ্জা-সরম, ভয়ডর, পাকচক্র, ঠাট্টাতামাসা, ইসারাইঙ্গিত, পাখীপাখালী জন্তুজানোয়ার, মামলামকদ্দমা, গা-গতর, খবরবার্ত্তা, অসুখবিসুখ গোনাগুন্তি, ভরাভর্ত্তি, কাঙালগরীব, গরীবদুঃখী, গরীবগুর্ব্বো, রাজারাজড়া, খাটপালং, বাজনাবাদ্য, কালিকিষ্টি, দয়ামায়া, মায়ামমতা, ঠাকুরদেবতা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, চালাকচতুর, শক্তসমর্থ,

গালিগালাজ, ভাবনাচিন্তে, ধরপাকড়, টানাহ্যাঁচড়া, বাঁধাছাঁদা, নাচাকোঁদা, বলাকওয়া, করাকর্ম্ম।

এমন কতকগুলি কথা আছে যাহার দুই অংশের কোনও অর্থ সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না যেমন—মেগেপেতে, কেঁদেকেটে, বেয়েছেয়ে, জুড়েতেড়ে, পুড়েঝুড়ে, কুড়িয়েবাড়িয়ে, আগেভাগে, গালমন্দ, পাকেপ্রকারে।

বাংলা ভাষায় "পত্র" শব্দযোগে যে কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে সেগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কারণ, গহনাপত্র শব্দে গহনা শব্দের সহিত পত্র শব্দের কোনোও অর্থ-সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ঐরূপ তৈজসপত্র, জিনিষপত্র, খরচপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, হিসাবপত্র, দেনাপত্র, আসবাবপত্র, পুঁথি-পত্র, বিষয়পত্র, চোতাপত্র, দলিলপত্র এবং খাতাপত্র। ইহাদের মধ্যে কোনোও কোনোও কথায় পত্র শব্দের কিঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যায় কিন্তু অনেক স্থলে নয়।

যে সকল জোড়াশব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু অর্থটা কাছাকাছি তাহাদের দৃষ্টান্ত :—মালমস্‌লা, দোকানহাট, হাঁকডাক, ধীরেসুস্থে, ভাবগতিক, ভাবভঙ্গি, লম্ফঝম্ফ, চালচলন, পালপার্ব্বন, কাণ্ডকারখানা, কালিঝুল, ঝড়ঝাপট, বনজঙ্গল, খানাখন্দ, জোত-জমা, লোকলস্কর, চুরিচামারি, উঁকিঝুঁকি, পাঁজিপুঁথি, লম্বাচওড়া, দলামলা, বাছবিচার, জ্বালাযন্ত্রণা, সাতপাঁচ, নয়ছয়, ছকড়া-নকড়া, উনিশবিশ, সাতসতেরো, আলাপপরিচয়, কথাবার্ত্তা, বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, হাসিখুসি, আমোদআহ্লাদ, লোহালক্কড়, শাকসবজি,

াদল, ঝড়তুফান, লাথিঝাঁটা, সেঁকতাপ, আদরঅভ্যর্থনা. চালচুলো, চাষবাস, মুটেমজুর, ছলবল।

ছাইভস্ম প্রভৃতি দুই সমানার্থক জোড়শব্দ জোর দিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়—"মালমসলা" "দোকানহাট" প্রভৃতি সমশ্রেণীর ভিন্নার্থক জোড়াশব্দে একটা ইত্যাদিসূচক অনির্দ্দিষ্টতা প্রকাশ করে। কাণ্ডকারখানা, চুরিচামারি, হাসিখুসি প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে ভাষাও আছে আভাসও আছে।

যে সকল পদার্থ আমরা সচরাচর এক সঙ্গে দেখি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়িয়া বাকিগুলাকে ইত্যাদিভাবে বুঝাইয়া দিবার প্রথাও বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন ঘটিবাটি। যদি বলা যায় "ঘটিবাটি সাম্‌লাইয়ো" তাহার অর্থ এমন নহে যে কেবল ঘটি ও বাটিই সাম্‌লাইতে হইবে—এই সঙ্গে থালা ঘড়া প্রভৃতি অনেক অস্থাবর জিনিষ আসিয়া পড়ে। কাহারো সহিত মাঠে ঘাটে দেখা হইয়া থাকে বলিলে কেবল যে ঐ দুটি মাত্র স্থানেই সাক্ষাৎ ঘটে তাহা বুঝায় না, উক্ত লোকটির সঙ্গে যেখানে সেখানেই দেখা হয় এইরূপ বুঝিতে হয়। এইরূপ জোড়া কথার দৃষ্টান্ত :—

পথঘাট, ঘরদুয়োর, ঘটিবাটি, কাছাকোঁচা, হাতিঘোড়া, বাঘভাল্লুক, খেলাধূলা, (খেলা—দেয়ালা) পড়াশুনা, খালবিল, লোকলস্কর, গাড়ুগামছা, লেপকাঁথা, গানবাজনা, ক্ষেতখোলা, কানা-খোঁড়া, কালিয়াপোলাও, শাকভাত, সেপাইসান্ত্রী, নাড়িনক্ষত্র, কোলেপিঠে, কাঠখড়, দত্যিদানা, ভূতপ্রেত।

বিপরীতার্থক শব্দ জুড়িয়া সমগ্রতা ও বৈপরীত্য বুঝাইবার দৃষ্টান্ত :—আগাগোড়া, ল্যাজামুড়ো, আকাশপাতাল, দেওয়াথোওয়া নরমগরম, আনাগোনা, উল্টোপাল্টা, তোলপাড়, আগাপাস্তাড়া।

এই যত প্রকার জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা—বাঘভাল্লুক না বলিয়া বাঘসিংহ বলিতে গেলে একটা অত্যাচার হইবে। বনজঙ্গল এবং ঝোপঝাড় শব্দকে বনঝাড় এবং ঝোপজঙ্গল বলিলে ভাষা নারাজ হয় অথচ অর্থের অসঙ্গতি হয় না।

এইখানে ইংরেজীতে যে সকল ইঙ্গিত বাক্য প্রচলিত আছে তাহার যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলার সহিত তুলনা করিলে পাঠকেরা সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। Nick-nack, riff raff, wishy-washy, dilly-dally, shilly-shally, pit-a-pat, bric--abrac.

এই উদাহরণগুলিতে জোড়াশব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে আকারের প্রাচুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, বাংলাতেও এইরূপ স্থলে শেষার্দ্ধে আকারটাই আসিয়া পড়ে। যেমন, হো-হা, জো-জা, জোর-জার। কিন্তু যেখানে প্রথমার্দ্ধে আকার থাকে দ্বিতীয়ার্দ্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশি, যেমন ঘা-ঘো, টান-টোন, টায়-টোয়, ঠারে-ঠোরে,। সব শেষে যদি ইকার থাকে তবে মাঝের ওকার উ হইয়া যায়, যেমন জারি-জুরি।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যঞ্জনবর্ণ বিকারের দৃষ্টান্ত— Hotch potch, higgledy-piggledy, harum-scarum, helter-skelter, hoity-toity, hurly-burly, rolly-polly, hugger-mugger, namby-pamby, wishy-washy.

আমাদের যেমন টুংটাং ইংরেজিতে তেমনি dingdong—আমাদের যেমন ঠঙাঠঙ্ ইংরেজিতে তেমনি ding-adong।

প্রথমার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের মিল নাই এমন দৃষ্টান্ত :—Topsy-turvy.

জোড়াশব্দের দুই অংশে মিল নাই এমন কথা সকল ভাষাতেই দুর্লভ। মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে—একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, জোড়ামিলের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে—সে স্বরের সাহায্য অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়। কবিতার মিলও এই সুবিধাটুকু ছাড়ে না—ছন্দের পর্ব্বে পর্ব্বে বারম্বার আঘাতে মনের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে—কেবলমাত্র কথা দ্বারা মন যতটুকু বুঝিত মিলের ঝঙ্কারে অনির্দ্দিষ্ট-ভাবে তাহাকে আরো অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হয় তাহাকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলে না।

এইখানে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার আশঙ্কা হইতেছে এই প্রবন্ধের বিষয়টি অনেকের কাছে অত্যন্ত

অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিবে। আমার কৈফিয়ৎ এই যে বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবজ্ঞেয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্রূপ। আমার মতো সাহিত্যওয়ালা বিপদে পড়িয়া বিজ্ঞানের দোহাই মানিলে লোকে হাসিবে কিন্তু প্রেমের নিবেদন যদি জানাই, বলি মাতৃ-ভাষার কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ নহে তবে আশা করি কেহ নাসা কুঞ্চিত করিবেন না। মাতাকে সংস্কৃত ভাষার সমাসসন্ধি তদ্ধিত-প্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝল্‌মল্ করিতে দেখিলে গর্ব্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিণী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি, তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

বৈয়াকরণের যে সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই,—শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু—কিন্তু বাংলা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্ত্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি, ইহাতে ব্যাকরণকে চির ঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিব না, ভুল-চুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে—কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার প্রকার আছে এবং এই আকৃতি প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার

ব্যাকরণ রচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয় তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা সকল সার্থক হইবে।

বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ

মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি অধিকাংশ গৌড়ীয় ভাষায় শব্দকে আড় করিয়া বলিবার একটা প্রথা আছে। যেমন হিন্দিতে "কুত্তা" সহজরূপ, "কুত্তে" বিকৃতরূপ। "ঘোড়া" সহজরূপ "ঘোড়ে" বিকৃতরূপ। মারাঠিতে ঘর ও ঘরা, বাপ ও বাপা, জীভ ও জীভে ইহার দৃষ্টান্ত।

এই বিকৃতরূপকে ইংরেজি পারিভাষিকে oblique form বলা হয়; আমরা তাহাকে তির্য্যক্‌রূপ নাম দিব।

অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার ন্যায় বাংলাভাষাতেও তির্য্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত আছে।

যেমন বাপা, ভায়া (ভাইয়া), চাঁদা, লেজা, ছাগলা, পাগ্‌লা, গোরা, কালা, আমা, তোমা, কাগাবগা (কাকবক), বাদলা. বামনা, কোণা ইত্যাদি।

সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় এই তির্য্যক্‌রূপের প্রচলন অধিক ছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত প্রাচীন বাক্য হইতে বুঝা যাইবে। "নরা গজা বিশে শয়।"

"গণ" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "গণা" কেবলমাত্র "গণাগুষ্ঠি" শব্দেই টিঁকিয়া আছে। "মুড়া" শব্দের সহজরূপ "মুড়" "মাথা-মোড় খোঁড়া" "ঘাড় মুড় ভাঙা" ইত্যাদি শব্দেই বর্ত্তমান। যেখানে আমরা বলি "গড়াগড়া ঘুমচ্চে" সেখানে এই "গড়া শব্দকে "গড়" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। "গড় হইয়া প্রণাম করা" ও "গড়ানো" ক্রিয়াপদে "গড়" শব্দের পরিচয় পাই। "দেব" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "দেবা" ও "দেয়া"। মেঘ ডাকা ও ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে "দেয়া" শব্দের ব্যবহার আছে। "যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী" বাক্যে "দেবা" শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় কাব্যভাষায় "সব" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "সবা" এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন আমাসবা, তোমাসবা, সবারে, সবাই। কাব্য-ভাষায় "জন" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "জনা"। সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে "জন" শব্দের যোগ হইলে চলিত ভাষায় তাহা অনেক স্থলেই "জনা" হয়। একজনা, দুইজনা ইত্যাদি। "জনাজনা" শব্দের অর্থ প্রত্যেক জন। আমরা বলিয়া থাকি "একো জনা একো রকম।"

তির্য্যক্‌রূপে সহজরূপ হইতে অর্থের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা ঘটে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। "হাত" শব্দকে নির্জ্জীব পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার কালে তাহাকে তির্য্যক্ করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন জামার হাতা, অথবা পাকশালার উপকরণ হাতা। "পা" শব্দের সম্বন্ধেও সেইরূপ "চৌকীর পায়া।" "পায়া ভারি" প্রভৃতি বিদ্রূপসূচক বাক্যে মানুষের সম্বন্ধে "পায়া" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সজীব প্রাণী সম্বন্ধে যাহা খুর, খাট প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাই খুরা। কান শব্দ কলস প্রভৃতির সংস্রবে প্রয়োগ করিবার বেলা "কানা" হইয়াছে। "কাঁধা" শব্দও সেইরূপ।

খাঁটি বাংলাভাষার বিশেষণ পদগুলি প্রায়ই হলন্ত নহে একথা রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে প্রথম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ "কাণ" বাংলায় তাহা "কানা"। সংস্কৃত "খঞ্জ" বাংলায় খোঁড়া। সংস্কৃত "অর্দ্ধ," বাংলা আধা। শাদা, রাঙা, বাঁকা, কালা, খাঁদা, পাকা, কাঁচা, মিঠা ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। "আলো" বিশেষ্য. "আলা" বিশেষণ। "ফাঁক" বিশেষ্য "ফাঁকা" বিশেষণ। "মা" বিশেষ্য, "মায়া" (মায়া মানুষ) বিশেষণ। এই আকার প্রয়োগের দ্বারা বিশেষণ নিষ্পন্ন করা ইহাও বাংলাভাষায় তির্য্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মারাঠিতে তির্য্যক্‌রূপে আকার ও একার দুই স্বরবর্ণের যেমন ব্যবহার দেখা যায় বাংলাতেও সেইরূপ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে আকারের ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি মাত্র শব্দে বদ্ধ হইয়া আছে;

তাহা সজীব ভাবে নাই, কিন্তু একারের ব্যবহার এখনও গতিবিশিষ্ট।

"পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়" এই বাক্যে "পাগলে" ও "ছাগলে" শব্দে যে একার দেখিতেছি তাহা উক্তপ্রকার তির্য্যক্‌রূপের একার। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর তির্য্যক্‌রূপ কোন্ কোন্ স্থলে ব্যবহৃত হয় আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সামান্য বিশেষ্য। বাংলায় নাম সংজ্ঞা (Proper names) ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যপদে যখন কোনো চিহ্ন থাকে না, তখন তাহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যেমন, বানর, টেবিল, কলম, ছুরি, ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিশেষ্য পদগুলির দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত বানর টেবিল চৌকি ছুরি বুঝাইতেছে, কোনো বিশেষ এক বা একাধিক বানর টেবিল চৌকি ছুরি বুঝাইতেছে না বলিয়াই ইহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য পদ নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা আবশ্যক ইংরেজি common names ও বাংলা সামান্য বিশেষ্যে প্রভেদ আছে। বাংলায় আমরা যেখানে বলি "এইখানে ছাগল আছে" সেখানে ইংরেজিতে বলে "There is *a* goat here" কিম্বা "There are goats here"। বাংলায় এস্থলে সাধারণভাবে বলা হইতেছে ছাগলজাতীয় জীব আছে। তাহা কোনো একটি বিশেষ ছাগল বা বহু ছাগল তাহা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই কিন্তু ইংরাজিতে এরূপ

স্থলেও বিশেষ্যপদকে article যোগে বা বহুবচনের চিহ্নযোগে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইংরেজিতে যেখানে বলে There is a bird in the cage" বা "There are birds in the cage" আমরা উভয়স্থলেই বলি "খাঁচায় পাখী আছে"—কারণ এস্থলে খাঁচার পাখী এক কিম্বা বহু তাহা বক্তব্য নহে কিন্তু খাঁচার মধ্যে পাখী নামক পদার্থ আছে ইহাই বক্তব্য। এই কারণে, এ সকল স্থলে বাংলায় সামান্য বিশেষ্য পদই ব্যবহৃত হয়।

এই সামান্য বিশেষ্যপদ যখন জীববাচক হয় প্রায় তখনই তাহা তির্য্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। কখনো বলি না, "গাছে নড়ে," বলি "গাছ নড়ে।" কিন্তু "বানরে লাফায়" বলিয়া থাকি। কেবল কর্ত্তৃকারকেই এই শ্রেণীর তির্য্যক্‌রূপের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু তাহার বিশেষ নিয়ম আছে।

প্লেগে ধরে বা ম্যালেরিয়ায় ধরে—এ রকম স্থলে প্লেগ ও ম্যালেরিয়া বস্তুতঃ অচেতন পদার্থ। কিন্তু আমরা বলিবার সময় উহাতে চেতনতা আরোপ করিয়া উহাকে আক্রমণ ক্রিয়ার সচেষ্টক কর্ত্তা বলিয়াই ধরি। তাই উহা রূপকভাবে চেতনবাচকের পর্য্যায় স্থান লাভ করিয়া তির্য্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্ত্তৃকারকে তির্য্যক্‌রূপ ধারণ করে। "এই ঘরে ছাগলে আছে" বলি না কিন্তু "ছাগলে ঘাস খায়" বলা যায়। বলি "পোকায় কেটেছে," কিন্তু অকর্ম্মক "লাগা" ক্রিয়ার

বেলায় "পোকা লেগেছে।" "তাকে ভূতে পেয়েছে" বলি "ভূত পেয়েছে" নয়। পাওয়া ক্রিয়া সকর্ম্মক।

কিন্তু এই সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক শব্দটি এখানে সম্পূর্ণ খাটিবে না। ইহার পরিবর্ত্তে বাংলায় নূতন শব্দ তৈরি করা আবশ্যক। আমরা এ স্থলে "সচেষ্টক" ও "অচেষ্টক" শব্দ ব্যবহার করিব। কারণ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সংস্রবে উহ্য বা ব্যক্তভাবে কর্ম্ম থাকা চাই কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর ক্রিয়ার কথা বলিতেছি তাহার কর্ম্ম না থাকিতেও পারে। "বানরে লাফায়" এই বাক্যে "বানর" শব্দ তির্য্যকরূপ গ্রহণ করিয়াছে, অথচ "লাফায়" ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই। কিন্তু "লাফানো" ক্রিয়াটি সচেষ্টক।

"আছে" এবং "থাকে" এই দুইটি ক্রিয়ার পার্থক্য চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, "আছে" ক্রিয়াটি অচেষ্টক কিন্তু "থাকে" ক্রিয়া সচেষ্টক—সংস্কৃত "অস্তি" এবং "তিষ্ঠতি" ইহার প্রতিশব্দ। "আছে" ক্রিয়ার কর্ত্তৃকারকে তির্য্যক্‌রূপ স্থান পায় না—"ঘরে মানুষে আছে" বলা চলে না কিন্তু "এ ঘরে কি মানুষে থাকৃতে পারে" এরূপ প্রয়োগ সঙ্গত।

"প্লেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে" এস্থলে মরা ক্রিয়া অচেষ্টক সন্দেহ নাই। "বেশি আদর পেলে ভালোমানুষেও বিগড়ে যায়", "অধ্যবসায়ের দ্বারা মূর্খেও পণ্ডিত হোতে পারে", "অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় বীরপুরুষেও ভীত হয়" এ সকল অচেষ্টক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে আমার নিয়ম খাটে না। বস্তুতঃ এই নিয়মে ব্যতিক্রম যথেষ্ট আছে।

কিন্তু "আছে" ক্রিয়ার স্থলে কর্তৃপদে একার বসে না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম এখনও ভাবিয়া পাই নাই।

আসা এবং যাওয়া ক্রিয়াটি যদিও সাধারণত সচেষ্টক, তবু তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়মটি ভালোরূপ খাটে না। আমরা বলি "সাপে কামড়ায়" বা "কুকুরে আঁচড়ায়" কিন্তু "সাপে আসে" বা "কুকুরে যায়" বলি না। অথচ "যাতায়াত করা" ক্রিয়ার অর্থ যদিচ যাওয়া আসা করা, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।— আমরা বলি "এ পথ দিয়ে মানুষে যাতায়াত করে, বা যাওয়া আসা করে" বা "আনাগোনা করে।" কারণ, "করে" ক্রিয়াযোগে আসাযাওয়াটা নিশ্চিত ভাবেই সচেষ্টক হইয়াছে। "খেতে যায়" বা "খেতে আসে" প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াপদেও এ নিয়ম অব্যাহত থাকে—যেমন, "এই পথ দিয়ে বাঘে জল খেতে যায়।"

"সকল" ও "সব" শব্দ সচেষ্টক অচেষ্টক উভয় শ্রেণীর ক্রিয়া সহযোগেই তির্য্যক্‌রূপ লাভ করে। যথা, এ ঘরে সকলেই আছেন বা সবাই আছে।

ইহার কারণ এই যে, "সকল" ও "সব" শব্দ দুটি বিশেষণ পদ। ইহারা তির্য্যক্‌রূপ ধারণ করিলে তবেই বিশেষ্যপদ হয়। "সকল" ও "সব" শব্দটি হয় বিশেষণ, নয় অন্য শব্দের যোগে বহুবচনের চিহ্ন—কিন্তু "সকলে" বা "সবে" বিশেষ্য। কথিত বাংলায় "সব" শব্দটি বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে দ্বিগুণ ভাবে তির্য্যক্‌-রূপ প্রাপ্ত হয়—প্রথমত "সব" হইতে হয় "সবা" তাহার পরে

পুনশ্চ তাহাতে এ যোগ হইয়া হয় "সবাএ"। এই "সবাএ" শব্দকে আমরা "সবাই" উচ্চারণ করিয়া থাকি।

"জন" শব্দ "সব" শব্দের ন্যায়। বাংলায় সাধারণতঃ "জন" শব্দ বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়। একজন লোক, দুজন মানুষ ইত্যাদি। বস্তুত মানুষের পূর্ব্বে সংখ্যা যোগ করিবার সময় আমরা তাহার সঙ্গে "জন" শব্দ যোজনা করিয়া দিই। পাঁচ মানুষ কখনোই বলি না, পাঁচজন মানুষ বলি। কিন্তু এই "জন" শব্দকে যদি বিশেষ্য করিতে হয় তবে ইহাকে তির্য্যক্‌রূপ দিয়া থাকি। দুজনে, পাঁচজনে ইত্যাদি। "সবাএ" শব্দের ন্যায় "জনাএ" শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে—এক্ষণে ইহা "জনায়" রূপে লিখিত হয়।

বাংলায় "অনেক" শব্দটি বিশেষণ। ইহাও বিশেষ্যরূপ গ্রহণ-কালে "অনেকে" হয়। সর্ব্বত্রই এ নিয়ম খাটে। "কালোএ" (কালোয়) যার মন ভুলেছে শাদাএ (শাদায়) তার কি করবে।" এখানে কালো ও শাদা বিশেষণপদ তির্য্যক্‌রূপ ধরিয়া বিশেষ্য হইয়াছে। "অপর" "অন্য" শব্দ বিশেষণ কিন্তু "অপরে" "অন্যে" বিশেষ্য। "দশ" শব্দ বিশেষণ, "দশে" বিশেষ্য (দশে যা বলে)।

নামসংজ্ঞা সম্বন্ধে এ প্রকার তির্য্যক্‌রূপ ব্যবহার হয় না—কখনো বলি না, "যাদবে ভাত খাচ্চে।" তাহার কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বিশেষ নাম কখনো সামান্য বিশেষ্য পদ হইতে পারে না। বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে "রামে

মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব।” বস্তুত এখানে “রাম” ও “রাবণ” সামান্য বিশেষ্য পদ—এখানে উক্ত দুই শব্দের দ্বারা দুই প্রতিপক্ষকে বুঝাইতেছে। কোনো বিশেষ রাম রাবণকে বুঝাইতেছে না।

তির্য্যকরূপের মধ্যে প্রায়ই একটি সমষ্টিবাচকতা থাকে। যথা “আত্মীয়ে তাকে ভাত দেয় না।” এখানে আত্মীয়সমষ্টিই বুঝাইতেছে। এইরূপ “লোকে বলে।” এখানে “লোকে” অর্থ সর্ব্বসাধারণে। “লোক বলে” কোনো মতেই হয় না। সমষ্টি যখন বুঝায় তখন “বানরে বাগান নষ্ট করিয়াছে” ইহাই ব্যবহার্য্য —“বানর করিয়াছে” বলিলে বানর দল বুঝাইবে না।

সংখ্যাসহযোগে বিশেষ্যপদ যদিচ সামান্যতা পরিহার করে তথাপি সকর্ম্মক রূপে তাহাদের প্রতিও একার প্রয়োগ হয়, যেমন “তিন শেয়ালে যুক্তি করে গর্ত্তে ঢুকল,” এমন কি “আমরা” “তোমরা” “তারা” ইত্যাদি সর্ব্বনাম বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্যপদ বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও সংখ্যার সংস্রবে তাহারা তির্য্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। যেমন, “তোমরা দুই বন্ধুতে” “সেই দুটো কুকুরে” ইত্যাদি।

অনেকের মধ্যে বিশেষ একাংশ যখন এমন কিছু করে অপরাংশ যাহা করে না তখন কর্ত্তৃপদে তির্য্যক্‌রূপ ব্যবহার হয়। যথা “তাদের মধ্যে দুজনে গেল দক্ষিণে”—এরূপ বাক্যের মধ্যে একটি অসমাপ্তি আছে। অর্থাৎ আর কেহ আর কোনো দিকে গিয়াছে বা বাকি কেহ যায় নাই এরূপ বুঝাইতেছে। যখন বলি

"একজনে বল্লে হাঁ" তখন "আর একজন বল্লে না" এমন আর একটা কিছু শুনিবার অপেক্ষা থাকে। কিন্তু যদি বলা যায় "একজন বল্লে, হাঁ" তবে সেই সংবাদই পর্য্যাপ্ত।

তির্য্যক্‌রূপে হলন্ত শব্দে একার যোজনা সহজ, যেমন বানর বানরে। (বাংলায় বানর শব্দ হলন্ত)। অকারান্ত, আকারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের সঙ্গেও "এ" যোজনায় বাধা নাই—"ঘোড়াএ" (ঘোড়ায়) "পেঁচোএ" (পেঁচোয়) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত অন্য স্বরান্ত শব্দে "এ" যোগ করিতে হইলে "ত" ব্যঞ্জনবর্ণকে মধ্যস্থ করিতে হয়। যেমন "গরুতে," ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে যখন ব্যঞ্জনকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ স্বর থাকে তখন "ত"কে মধ্যস্থরূপে প্রয়োজন হয় না। যেমন উই, উইএ (উইয়ে), বউ, বউএ (বউয়ে) ইত্যাদি। একথা মনে রাখা আবশ্যক বাংলায় বিভক্তিরূপে যেখানে একার প্রয়োগ হয় সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই বিকল্পে "তে" প্রয়োগ হইতে পারে। এই জন্য "ঘোড়ায় লাথি মেরেছে" এবং "ঘোড়াতে লাথি মেরেছে" দুইই হয়। "উইয়ে নষ্ট করেছে এবং "উইতে" বা "উইয়েতে" নষ্ট করেছে।" হলন্ত শব্দে এই "তে" বিভক্তি গ্রহণকালে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনে পুনশ্চ একার যোগ করিতে হয়। যেমন "বানরেতে," "ছাগলেতে"।

১৮১৮

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য *

আমরা পূর্ব্বে একপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বাংলায় নামসংজ্ঞা ছাড়া বিশেষ্যপদবাচক শব্দ মাত্রই সহজ অবস্থায় সামান্য বিশেষ্য। অর্থাৎ তাহা জাতিবাচক। যেমন, শুধু "কাগজ" বলিলে

---

* বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ নামক প্রবন্ধে, বাংলার বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্ত্তৃকারকে একার যোগে যে রূপ হয় তাহাকে তির্য্যক্‌রূপ নাম দিয়াছিলাম। তাহাতে কোনো পাঠক আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাকে বলা উচিত কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। নাম লইয়া তর্ক নিষ্ফল। না হয় নাই বলিলাম "তির্য্যক্‌রূপ"—না হয় আর কোনো নাম দেওয়া গেল। আমার বক্তব্য এই ছিল, যে, কোনো কোনো স্থলে বাংলা বিশেষ্যপদ তাহার সহজরূপ পরিত্যাগ করে। তাহার এই রূপের বিকারকেই অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া "তির্য্যক্‌রূপ" নাম দিয়াছিলাম। ঘোড়ে, কুত্তে প্রভৃতি হিন্দি শব্দই হিন্দি তির্য্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত; ঘোড়্‌ওয়া কাহারওয়া, প্রভৃতি শব্দ নহে—অন্ততঃ তুলনামূলক ব্যাকরণবিদ্‌গণ শেষোক্তগুলিকে তির্য্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই,—বাংলা কর্ত্তৃকারকের একারসংযুক্ত রূপকে যদি সংস্কৃত কোনো বিভক্তির নাম দিতেই হয় তবে আমার মতে তাহা সপ্তমী নহে তৃতীয়া। বাংলা "বাঘে খাইল" বাক্যটি সংস্কৃত "ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ" বাক্য হইতে উৎপন্ন এমন অনুমান করা যাইতেও পারে। যাহাই হোক্ এসকল অনুমানের কথা। আমার সে প্রবন্ধে আসল কথাটা ব্যাকরণের নাম নহে, ব্যাকরণের নিয়ম।

বিশেষভাবে একটি বা অনেকগুলি কাগজ বোঝায় না, তাহার দ্বারা সমস্ত কাগজকেই বোঝায়।

এমন স্থলে যদি কোনো বিশেষ কাগজকে আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই তবে সেজন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

ইংরেজি ব্যাকরণে এইরূপ নির্দ্দেশক চিহ্নকে Article বলে। বাংলাতেও এই শ্রেণীর সঙ্কেত আছে। সেই সঙ্কেতের দ্বারা সামান্য বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ ধারণ করিয়া বিশেষ বিশেষ্যে পরিণত হয়। একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, বিশেষ্যপদ, একবচন বা বহুবচনরূপ গ্রহণ করিলেই, সামান্যতা পরিহার করে। একটি ঘোড়া বা তিনটি ঘোড়া বলিলেই ঘোড়া শব্দের জাতিবাচক অর্থ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে—তখন বিশেষ এক বা একাধিক ঘোড়া বোঝায়—সুতরাং তখন তাহাকে সামান্য বিশেষ্য না বলিয়া বিশেষ বিশেষ্য বলাই উচিত। এই কথা চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আমাদের সামান্য বিশেষ্য এবং ইংরেজি Common name এক নহে।

বিশেষ বিশেষ্য একবচন

মোটামুটি বলা যাইতে পারে বাংলার নির্দ্দেশক চিহ্নগুলি শব্দের পূর্ব্বে না বসিয়া শব্দের পরেই যোজিত হয়। ইংরেজিতে "the room"—বাংলায় "ঘরটি"। এখানে "টি" নির্দ্দেশক চিহ্ন।

টি ও টা

ইংরেজিতে the আর্টিক্‌ল্ একবচন এবং বহুবচন উভয়ত্রই বসে কিন্তু বাংলায় টি ও টা সঙ্কেতের দ্বারা একটিমাত্র পদার্থকে

বিশিষ্ট করা হয়। যখন বলা হয়, "রাস্তা কোন্ দিকে" তখন সাধারণভাবে পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়—যখন বলি, "রাস্তাটা কোন্ দিকে"—তখন বিশেষ একটা রাস্তা কোন্ দিকে সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়।

ইংরেজিতে "the" শব্দের প্রয়োগ যত ব্যাপক বাংলায় "টি" তেমন নহে। আমাদের ভাষায় এই প্রয়োগ সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা আছে। সেই জন্যে যখন সাধারণ ভাবে আমরা খবর দিতে চাই, মধু বাহিরে নাই, তখন আমরা শুধু বলি, মধু ঘরে আছে—ঘর শব্দের সঙ্গে কোনো নির্দেশক চিহ্ন যোজনা করি না। কারণ ঘরটাকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। ইংরেজিতে এস্থলেও "the room" বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোনো একটি বিশেষ ঘরে মধু আছে এই সংবাদটি দিবার প্রয়োজন ঘটে তখন আমরা বলি, ঘরটাতে মধু আছে। এইরূপ, যে বাক্যে একাধিক বিশেষ্যপদ আছে তাহাদের মধ্যে বক্তা যেটিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে চান সেইটির সঙ্গেই নির্দেশক যোজনা করেন। যেমন, গোরুটা মাঠে চরছে, বা মাঠটাতে গোরু চরছে। জাজিমটা ঘরে পাতা, বা ঘরটাতে জাজিম পাতা। "আমার মন খারাপ হয়ে গেছে" বা "আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে"—দুইই আমরা বলি। প্রথম বাক্যে, মন খারাপ হওয়া ব্যাপারটাই বলা হইতেছে—দ্বিতীয় বাক্যে, আমার মনই যে খারাপ হইয়া গেছে তাহার উপরেই ঝোঁক।

"টি" সঙ্কেতটি ছোটো আয়তনের জিনিষ ও আদরের জিনিষ

সম্বন্ধে এবং "টা" বড়ো জিনিষ সম্বন্ধে বা অবজ্ঞা কিম্বা অপ্রিয়তা বুঝাইবার স্থলে বসে। যে পদার্থ সম্বন্ধে আদর বা অনাদর কিছুই বোঝায় না তৎসম্বন্ধেও "টা" প্রয়োগ হয়। "ছাতাটি কোথায়" এই বাক্যে ছাতার প্রতি বক্তার একটু যত্ন প্রকাশ হয়, কিন্তু "ছাতাটা কোথায়" বলিলে যত্ন বা অযত্ন কিছুই বোঝায় না।

সাধারণত নামসংজ্ঞার সহিত "টা" "টি" বসে না। কিন্তু বিশেষ কারণে ঝোঁক দিতে হইলে নামসংজ্ঞার সঙ্গেও নির্দ্দেশক বসে। যেমন, হরিটা বাড়ি গেছে। সম্ভবত হরির বাড়ি যাওয়া বক্তার পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই, টা তাহাই বুঝাইল। "রামটি মারা গেছে" এখানে বিশেষ ভাবে করুণা প্রকাশের জন্য টি বসিল। এইরূপ, শ্যামটা ভারি দুষ্ট, শৈলটি ভারি ভালো মেয়ে। এইরূপে টি ও টা অনেক স্থলে বিশেষ পদের সঙ্গে বক্তার হৃদয়ের স্বর মিশাইয়া দেয়। বলা আবশ্যক মান্য ব্যক্তির নাম সম্বন্ধে টি বা টা ব্যবহার হয় না।

সামান্যতাবাচক বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদকেও বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইলে নির্দ্দেশক প্রয়োগ করা যায়—যেমন "গিরিডির কয়লাটা ভালো", "বেহারের মাটিটা উর্ব্বরা", "এখানে মশাটা বড়ো বেশি", "ভীম নাগ সন্দেশটা করে ভালো।" কিন্তু শুদ্ধ অস্তিত্ব জ্ঞাপনের সময় এরূপ প্রয়োগ খাটে না ; বলা যায় না, "ভীমের দোকানে সন্দেশটা আছে।"

এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখন বলা

যায়, "বেহারের মাটিটা উর্ব্বরা" বা "ভীমের দোকানের সন্দেশটা ভালো" তখন প্রশংসা সূচনা সত্ত্বেও "টা" নির্দ্দেশক ব্যবহার হয় তাহার কারণ এই যে, এই বিশেষ্য পদগুলিতে যে সকল বস্তু বুঝাইতেছে তাহা পরিমাণে অল্প নহে।

যখন আমরা কর্ত্তৃবাচক বিশেষ্যকে সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়া পরিচয়বাচক বিশেষ্যকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করি, তখন শেষোক্ত বিশেষ্যের সহিত নির্দ্দেশক যোগ হয়। যেমন, "হরি মানুষটা ভালো," "বাঘ জন্তুটা ভীষণ।"

সাধারণতঃ গুণবাচক বিশেষ্যে নির্দ্দেশক যোগ হয় না—বিশেষত শুদ্ধমাত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপনকালে তো হয়ই না। যেমন, আমরা বলি, "রামের সাহস আছে।"—কিন্তু "রামের সাহসটা কম নয়", "উমার লজ্জাটা বেশি" বলিয়া উমার বিশেষ লজ্জা ও রামের বিশেষ সাহসের উল্লেখকালে টা প্রয়োগ করি।

ইংরেজিতে "this" "my" প্রভৃতি সর্ব্বনাম বিশেষণ পদ থাকিলে বিশেষ্যের পূর্ব্বে আর্টিক্‌ল্ বসে না কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। এরূপ স্থলে বিশেষ করিয়াই নির্দ্দেশক বসে। যেমন, "এই বইটা," আমার কলমটি।"

বিশেষণ পদের সঙ্গে "টা" "টি" যুক্ত হয় না। যদি যুক্ত হয় তবে তাহা বিশেষ্য হইয়া যায়। যেমন, "অনেকটা নষ্ট হয়েছে", "অর্দ্ধেকটা রাখো", "একটা দাও","আমারটা লও","তোমরা কেবল মন্দটাই দেখো" ইত্যাদি।

নির্দ্দেশক-চিহ্ন-যুক্ত বিশেষ্যপদে কারকের চিহ্নগুলি নির্দ্দেশকের

সহিত যুক্ত হয়। যেমন "মেয়েটির", "লোকটাকে", "বাড়িটাতে" ইত্যাদি।

অচেতন পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে কর্ম্মকারকে "কে" বিভক্তি-চিহ্ন প্রায় বসে না। কিন্তু "টি" "টা"র সহযোগে বসিতে পারে। যেমন, "লোহাটাকে", "টেবিলটিকে" ইত্যাদি।

ক্রোশটাক্ সেরটাক্ প্রভৃতি দূরত্ব ও পরিমাণ-বাচক শব্দের "টাক্" প্রত্যয়টি টা ও এক শব্দের সন্ধিজাত। কিন্তু এই "টাক্" প্রত্যয়যোগে উক্ত শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ক্রেশটাক্ পথ, সেরটাক্ দুধ ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে করেন এগুলি বিশেষণ নহে। কারণ, বিশেষ্য ভাবেও উহাদের প্রয়োগ হয়। যেমন, "ক্রোশটাক্ গিয়েই বসে পড়ল", "পোয়াটাক্ হোলেই চলবে।"

যদিচ সাধারণত টি টা প্রভৃতি নির্দ্দেশক সঙ্কেত বিশেষণের সহিত বসে না, তবু একস্থলে তাহার ব্যতিক্রম আছে। সংখ্যা-বাচক শব্দের সহিত নির্দ্দেশক যুক্ত হইয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটা গাছ, দুইটি মেয়ে ইত্যাদি।

বাংলায় ইংরেজি Indefinite articleএর অনুরূপ শব্দ, একটি, একটা। একটা মানুষ বলিলে অনির্দ্দিষ্ট কোনো একজন মানুষ বুঝায়। "একটা মানুষ ঘরে এল" এবং "মানুষটা ঘরে এল" এই দুই বাক্যের মধ্যে অর্থভেদ এই—প্রথম বাক্যে যে হউক্ একজন মানুষ ঘরে আসিল এই তথ্য বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ কোনো একজন মানুষের কথা বলা হইতেছে।

কিন্তু "একটা" বা "একটি" যখন বিশেষভাবে এক সংখ্যাকে জ্ঞাপন করে তখন তাহাকে indefinite বলা চলে না। ইংরেজিতে তাহার প্রতিশব্দ one। সেখানে একটা লোক মানে এক সংখ্যক লোক, কোনো একজন অনির্দ্দিষ্ট লোক নহে।

যেখানে "এক" শব্দটি অপর একটি বিশেষণের পরে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় সেখানে সাধারণত "টি" "টা" প্রয়োগ চলে না যেমন, লম্বা-এক ফর্দ্দ, মস্ত-এক বাবু, সাত হাত এক লাঠি।

বলা বাহুল্য, এক ভিন্ন অন্য সংখ্যা সহযোগে যেখানে টি টা বসে সেখানে তাহাকে Indefinite articleএর সহিত তুলনীয় করা চলে না, সেখানে তাহা সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

খানি খানা প্রভৃতি আরো কয়েকটি নির্দ্দেশক চিহ্ন আছে, তাহাদের কথা পরে হইবে।

বলা আবশ্যক সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে গিয়া বাংলা লিখিত ভাষায় নির্দ্দেশক সঙ্কেতের ব্যবহার বিরল হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী তাঁহাদের রচনায় ইহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু বাংলায় বক্তা ইচ্ছা করিলে কোনো একটি বিশেষ্যপদকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতেও পারেন নাও করিতে পারেন সেইজন্য ইহাকে বর্জ্জন করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক রীতিকে ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে দুর্ব্বল করা হয়। আধুনিক কালের লেখকগণ মাতৃভাষার সমস্ত স্বকীয় সম্পদগুলিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশই

ভাষাকে প্রাণপূর্ণ ও বেগবান করিয়া তুলিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।*

১৩১৮

বাংলা নির্দ্দেশক

আমরা বাংলা ভাষার নির্দ্দেশক চিহ্ন "টি" ও "টা" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই শ্রেণীর সঙ্কেত আরো কয়েকটি আছে।

খানি ও খানা

বাংলা ভাষায় "গোটা" শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়। এই কারণে, এই "গোটা" শব্দেরই অপভ্রংশ "টা" চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে। হরিণটা, টেবিলটা, মাঠটা, শব্দে একটা সমগ্র পদার্থ বুঝাইতেছে।

* এই প্রবন্ধে নির্দ্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন, এইরূপ নামকরণ অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই। এই সকল নামকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষার মর্ম্মগত সমস্ত নিয়মের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ভুল ও অসম্পূর্ণতা থাকাই সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার নিয়ম আলোচনার চেষ্টা তেমন করিয়া হয় নাই। পাঠকগণ আমার এই ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধের ভুল সংশোধন ও অভাব পূরণ করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

বাংলা ভাষার অপর একটি একত্ব নির্দ্দেশক চিহ্ন খানা, খানি। "খণ্ড" শব্দ হইতে উহার উৎপত্তি। এখনও বাংলায় "খান্‌-খান্‌" শব্দের দ্বারা খণ্ড খণ্ড বুঝায়।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এক একটি সমগ্র বস্তুকে বুঝাইতে "টা" চিহ্নের প্রয়োগ এবং এক একটি খণ্ডকে বুঝাইতে "খানা" চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গোড়ায় কী ছিল বলিতে পারি না এখন কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। আমরা বলি কাগজখানা, শ্লেটখানা। এই কাগজ ও শ্লেট সমগ্র পদার্থ হইলেও আসে যায় না।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যেসকল সামগ্রী দীর্ঘ প্রস্থ বেধে সম্পূর্ণ, সাধারণত তাহাদের সম্বন্ধে "খানা" ব্যবহার হয় না। যে জিনিষকে প্রস্থের প্রসারের দিক হইতেই দেখি, লম্বের বা বেধের দিক হইতে নয় প্রধানত তাহারই সম্বন্ধে "খানা" "খানি"র যোগ। মাঠখানা ক্ষেতখানা; কিন্তু পাহাড়খানা নদীখানা নয়। থালখানা, খাতা খানা; কিন্তু ঘটিখানা বাটিখানা নয়। লুচিখানা, কচুরিখানা; কিন্তু সন্দেশখানা মেঠাইখানা নয়। শালপাতাখানা, কলাপাতা-খানা; কিন্তু আমখানা কাঁটালখানা নয়।

এই যে নিয়মের উল্লেখ করা গেল ইহা সর্ব্বত্র খাটে না। যে জিনিষ পাতলা নহে তাহার সম্বন্ধেও "খানা" ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন খাটখানা, চৌকিখানা, ঘরখানা, নৌকাখানা। ইহাও দেখা গিয়াছে, এই "খানা" চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের অভ্যাস সমান নহে।

তবে "খানার" প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম বলা যায়। জীব সম্বন্ধে কোথাও ইহার ব্যবহার নাই; গোরুখানা ভেড়াখানা হয় না। দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহারে বাধা নাই। দেহখানা, হাতখানা, পাখানা। বুকখানা সাত হাত হয়ে উঠ্‌ল; মায়ের কোলখানি ভ'রে আছে; মাংস-খানা ঝুলে পড়েছে; ঠোঁটখানি রাঙা; ভুরুখানি বাঁকা।

অরূপ পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। বাতাসখানা বলা চলে না; আলোখানাও সেইরূপ; কারণ, তাহার অবয়ব নাই। যত্নখানা, আদরখানা, ভয়খানা, রাগখানা হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে; যথা, ভাবখানা, স্বভাবখানা, ধরণখানা, চলনখানি।

যে সকল বস্তু অবয়ব গ্রহণ না করিয়া তরল বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে তাহাদের সম্বন্ধে "খানা" বসে না। যেমন, বালিখানা, ধূলোখানা, মাটিখানা, দুধখানা, জলখানা তেলখানা হয় না।

ধূলা কাদা তেল জল প্রভৃতি শব্দের সহিত "এক" শব্দটিকে বিশেষণরূপে যোগ করা যায় না। যেমন, একটা ধূলা বা একটা জল বলি না। কিন্তু "অনেক" শব্দটির সহিত এরূপ কোনো বাধা নাই। যেমন, অনেকটা জল বা অনেকখানি জল বলা চলে। বলা বাহুল্য এখানে "অনেক" শব্দ দ্বারা সংখ্যা বুঝাইতেছে না— পরিমাণ বুঝাইতেছে।

এখানে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এরূপ স্থলে আমরা খানি ব্যবহার করি; খানা ব্যবহার করি না। "অনেক-খানি দুধ" বলি, "অনেকখানা দুধ" বলি না। এস্থলে দেখা

যাইতেছে, পরিমাণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে "খানি" ব্যবহার হয়, "খানা" কেবলমাত্র সংখ্যা সম্বন্ধেই খাটে।

বাংলায় হাসিখানি শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা আদরের ভাষা। আদর করিয়া হাসিকে যেন স্বতন্ত্র একটি বস্তুর মতো করিয়া দেখা যাইতেছে। মনে পড়িতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন ভাবের কথা কোথায় দেখিয়াছি যে, "তাহার মুখের কথাখানির যদি লাগ পাইতাম"—এখানে আদর করিয়া মুখের কথাটিকে যেন মূর্ত্তি দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবেই "স্পর্শখানি" বলিয়া থাকি।

খানি ও খানা যেখানে বসে সেখানে ইচ্ছামতো সর্ব্বত্রই টি ও টা বসিতে পারে—কিন্তু টি ও টার স্থলে সর্ব্বত্র খানি ও খানার অধিকার নাই।

গাছা ও গাছি।

"খানি খানা" যেমন মোটের উপরে চওড়া জিনিষের পক্ষে, "গাছা" তেমনি সরু জিনিষের পক্ষে। যেমন, ছড়িগাছা, লাঠি-গাছা, দড়িগাছা,সুতোগাছা, হারগাছা, মালাগাছা, চুড়িগাছা, মল-গাছা, শিকলগাছা।

এই সঙ্কেতের সঙ্গে যখন পুনশ্চ "টি" ও "টা" চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে তখন "গাছি" "গাছা" শব্দের অন্তস্থিত ইকার আকার লুপ্ত হইয়া যায়। যথা লাঠিগাছটা মালাগাছটা ইত্যাদি।

জীববাচক পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। কেঁচোগাছি, বলা চলে না।

সরু জিনিষ লম্বায় ছোটো হইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার হয় না। দড়িগাছা, কিন্তু গোঁফগাছা নয়। শলাগাছটা কিন্তু ছুঁচ-গাছটা নয়। চুলগাছি যখন বলা হয় তখন লম্বা চুলই বুঝায়।

যেখানে গাছি ও গাছা বসে সেখানে সর্ব্বত্রই বিকল্পে টি ও টা বসিতে পারে—এবং কোনো কোনো স্থলে খানি ও খানা বসিতে পারে।

টুকু।

টুকু শব্দ সংস্কৃত তনুক শব্দ হইতে উৎপন্ন। মৈথিলি সাহিত্যে তনুক শব্দ দেখিয়াছি। "তনিক" এখনও হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার সগোত্র "টুক্‌রা" শব্দ বাংলায় চলিত আছে।

টুকু স্বল্পতাবাচক।

সজীবপদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। ভেড়াটুকু গাধা-টুকু হয় না। পরিহাসচ্ছলে মানুষটুকু বলা চলে।

ক্ষুদ্রায়তন হইলেও এমন পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় না যাহার বিশেষ গঠন আছে। যেমন এয়ারিংটুকু বলা যায় না, সোনাটুকু বলা যায়। পদ্মটুকু বলা যায় না, চুনটুকু বলা যায়। পাগড়িটুকু বলা যায় না, রেশমটুকু বলা যায়। অর্থাৎ যাহাকে টুক্‌রা করিলে তাহার বিশেষত্ব যায় না তাহার সম্বন্ধেই "টুকু" ব্যবহার করা চলে। কাগজকে টুক্‌রা করিলেও তাহা কাগজ, কাপড়কে টুক্‌রা করিলেও তাহা কাপড়, এক পুকুর জলও জল, এক ফোঁটা জলও

জল এইজন্য কাগজটুকু কাপড়টুকু জলটুকু বলা যায় কিন্তু চৌকি-টুকু খাটটুকু বলা যায় না।

কিন্তু এই ঐ সেই কত এত তত যত সর্ব্বনাম পদের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রার্থক সকল বিশেষ্যপদের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন এইটুকু মানুষ, ঐটুকু বাড়ি, ঐটুকু পাহাড়।

অরূপ পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে ইহার ব্যবহার চলে। যেমন হাওয়াটুকু, কৌশলটুকু, ভারটুকু, সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকু।

অন্যান্য নির্দ্দেশক চিহ্নের ন্যায় "এক" বিশেষণ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা ব্যবহৃত হয়—কিন্তু দুই তিন প্রভৃতি অন্য সংখ্যার সহিত ইহার যোগ নাই। দুইটা, দুই খানি, দুই গাছি হয় কিন্তু দুইটুকু তিনটুকু হয় না। "এক" শব্দের সহিত যোগ হইলে টুকু বিকল্পে টু হয় যথা একটু। অন্যত্র কোথাও এরূপ হয় না। এই "একটু" শব্দের সহিত "খানি" যোজনা করা যায়—যথা, একটুখানি বা একটুকুখানি। এখানে "খানা" চলে না। অন্যত্র, যেখানে টুকু বসিতে পারে সেখানে কোথাও বিকল্পে খানি খানা বসিতে পারে না, কিন্তু টি টা সর্ব্বত্রই বসে।

১৩১৮

বাংলা বহুবচন

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "গোটা" শব্দের অর্থ সমগ্র। বাংলায় যেখানে বলে "একটা", উড়িয়া ভাষায় সেখানে বলে গোটা। এবং এই গোটা শব্দের টা অংশই বাংলা বিশেষ বিশেষ্যে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে ইহার প্রথম অংশটুকু ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে "চৌকিটা", পূর্ব্ববঙ্গে "চৌকি গুয়া।"

ভাষায় অন্যত্র ইহার নজির আছে। একদা "কর" শব্দ সম্বন্ধকারকের চিহ্ন ছিল—যথা, তোমাকর, তাকর।—এখন পশ্চিমভারতে ইহার "ক" অংশ ও পূর্ব্বভারতে "র" অংশ সম্বন্ধ-চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দি হম্‌কা, বাংলা আমার।

একবচনে যেমন গোটা, বহুবচনে তেমনি গুলা। (মানুষগোটা), মানুষটা একবচন, মানুষগুলা বহুবচন। উড়িয়া ভাষায় এইরূপ বহুবচনার্থে "গুড়িয়ে" শব্দের ব্যবহার আছে।

এই "গোটা"রই বহুবচনরূপ গুলা, তাহার প্রমাণ এই, যে, "টা" সংযোগে যেমন বিশেষ্যশব্দ তাহার সামান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে—গুলা ও গুলির দ্বারাও সেইরূপ ঘটে। যেমন, "টেবিলগুলা বাঁকা"—অর্থাৎ বিশেষ

কয়েকটি টেবিল বাঁকা, সামান্যত টেবিল বাঁকা নহে। কাক শাদা বলা চলে না, কিন্তু কাকগুলো শাদা বলা চলে, কারণ, বিশেষ কয়েকটা কাক শাদা হওয়া অসম্ভব নহে।

এই "গুলা" শব্দযোগে বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন করাই বাংলার সাধারণ নিয়ম। বিশেষস্থলে বিকল্পে শব্দের সহিত "রা" ও "এরা" যোগ হয়। যেমন, মানুষেরা, কেরাণীরা ইত্যাদি।

এই "রা" ও "এরা" জীববাচক বিশেষ্যপদ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না।

হলন্ত শব্দের সঙ্গে "এরা" এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে "রা" যুক্ত হয়। যেমন বালকেরা, বধূরা। বালকগুলি, বধূগুলি ইত্যাদিও হয়।

কথিতভাষায় এই "এরা" চিহ্নের "এ" প্রায়ই লুপ্ত হইয়া থাকে—আমরা বলি বালকরা, ছাত্ররা, ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য পদেরও বহুবচনরূপ হইয়া থাকে। যথা রামেরা—অর্থাৎ রাম ও আনুষঙ্গিক অন্য সকলে। এরূপস্থলে কদাপি গুলা গুলির প্রয়োগ হয় না। কারণ রামগুলি বলিলে প্রত্যেকটিরই রাম হওয়া আবশ্যক হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই "এরা" সম্বন্ধকারকরূপ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহারা তাহারাই "রামেরা"। যেমন তির্য্যকরূপে "জন" শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে "জনা", সেইরূপ "রামের" শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে রামেরা।

"সব", "সকল" ও "সমুদয়" শব্দ বিশেষ্যশব্দের পূর্ব্বে বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়া বহুত্ব অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু বস্তুত এই বিশেষণগুলি সমষ্টিবাচক। "সব লোক" এবং "লোকগুলি"র মধ্যে অর্থভেদ আছে। "সব লোক" ইংরেজিতে all men এবং লোকগুলি the men।

লিখিত বাংলায়, "সকল" ও "সমুদয়" শব্দ বিশেষ্যপদের পরে বসে। কিন্তু কথিত বাংলায় কখনই তাহা হয় না। সকল গোরু বলি, গোরু সকল বলি না। বাংলাভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ প্রয়োগ সম্ভবত আধুনিককালে গদ্যরচনা সৃষ্টির সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। লিখিত ভাষায় "সকল" যখন কোনো শব্দের পরে বসে তখন তাহা তাহার মূল অর্থ ত্যাগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচনের ভাব দান করে। লোকগুলি এবং লোকসকল একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রাচীন লিখিত ভাষায় "সব" শব্দ বিশেষ্যপদের পরে যুক্ত হইত। এখন সে রীতি উঠিয়া গেছে, এখন কেবল পূর্ব্বেই তাহার ব্যবহার আছে। কেবল বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যে এখনো ইহার প্রয়োগ দেখা যায়—যথা "পাখী সব করে রব।" বর্ত্তমানে, বিশেষ্যপদের পরে "সব" শব্দ বসাইতে হইলে বিশেষ্য বহুবচনরূপ গ্রহণ করে। যথা পাখীরা সব, ছেলেরা সব অথবা ছেলেরা সবাই। বলা বাহুল্য জীববাচক শব্দ ব্যতীত অন্যত্র বহুবচনে এই "রা" ও "এরা" চিহ্ন বসে না। বানরগুলা সব, ঘোড়াগুলা সব, টেবিলগুলা সব, দোয়াতগুলা সব—এইরূপ, গুলাযোগে সচেতন

অচেতন সকল পদার্থ সম্বন্ধেই "সব" শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

"অনেক" বিশেষণ শব্দ যখন বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে বসে তখন স্বভাবতই তদ্দ্বারা বিশেষ্যের বহুত্ব বুঝায়। কিন্তু এই "অনেক" বিশেষণের সংশ্রবে বিশেষ্যপদ পুনশ্চ বহুবচনরূপ গ্রহণ করে না। ইংরেজিতে many বিশেষণ সত্ত্বেও man শব্দ বহুবচনরূপ গ্রহণ করিয়া men হয়—সংস্কৃতে অনেকা লোকাঃ, কিন্তু বাংলায় অনেক লোকগুলি হয় না।

অথচ "সকল" বিশেষণের যোগে বিশেষ্যপদ বিকল্পে বহুবচনরূপও গ্রহণ করে। আমরা বলিয়া থাকি, সকল সভ্যেরাই এসেছেন—সকল সভ্যই এসেছেন এরূপও বলা যায়। কিন্তু অনেক সভ্যেরা এসেছেন কোনো মতেই বলা চলে না। "সব" শব্দও "সকল" শব্দের ন্যায়। "সব পালোয়ানরাই সমান" এবং "সব পালোয়ানই সমান" দুই চলে।

"বিস্তর" শব্দ "অনেক" শব্দের ন্যায়। অর্থাৎ এই বিশেষণ পূর্ব্বে থাকিলে বিশেষ্যপদ আর বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না— "বিস্তর লোকেরা" বলা চলে না।

এইরূপ আর একটি শব্দ আছে তাহা লিখিত বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না—কিন্তু কথিত বাংলায় তাহারই ব্যবহার অধিক, সেটি "ঢের"। ইহার নিয়ম "বিস্তর" ও "অনেক" শব্দের ন্যায়ই। "গুচ্ছার" শব্দও প্রাকৃত বাংলায় প্রচলিত। ইহা প্রায়ই বিরক্তি-প্রকাশক। যখন বলি গুচ্ছার লোক জমেছে তখন বুঝিতে

হইবে সেই লোকসমাগম প্রীতিকর নহে। ইহা সম্ভবত গোটাচার শব্দ হইতে উদ্ভূত।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পূর্ব্বে যুক্ত হইলে বিশেষ্যপদ বহুবচনরূপ গ্রহণ করে না। যেমন, চার দিন, তিন জন, দুটো আম।

গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, চয়, মালা, শ্রেণী, পংক্তি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা সংস্কৃত রীতি। এইজন্য অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। বস্তুত ইহাদিগকে বহুবচনের চিহ্ন বলাই চলে না। কারণ ইহাদের সম্বন্ধেও বহুবচনের প্রয়োগ হইতে পারে—যেমন সৈন্যগণেরা, পদাতিকদলেরা, ইত্যাদি। ইহারা সমষ্টিবোধক।

ইহাদের মধ্যে "গণ" শব্দ প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত হইয়াছে। এইজন্য "পদাতিকগণ" এবং "পাইকগণ" দুই বলা চলে। কিন্তু "লাঠিয়ালবৃন্দ" "কলুকুল" বা "আটচালাচয়" বলা চলে না।

গণ, মালা, শ্রেণী ও পংক্তি শব্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। গণ ও দল কেবল প্রাণীবাচক শব্দের সহিতই চলে। কখনো কখনো রূপকভাবে মেঘদল তরঙ্গদল বৃক্ষদল প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মালা, শ্রেণী ও পংক্তি শব্দের অর্থ অনুসারেই তাহার ব্যবহার, একথা বলা বাহুল্য।

প্রাকৃত বাংলায় এইরূপ অর্থবোধক শব্দ ঝাঁক, গোচ্ছা, আঁটি, গ্রাস। কিন্তু এগুলি, সমাসরূপে শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় না। আমরা বলি পাখীর ঝাঁক, চাবির গোচ্ছা, ধানের আঁটি, ভাতের

গ্রাস, অথবা দুই ঝাঁক পাখী, এক গোচ্ছা চাবি, চার আঁটি ধান, দুই গ্রাস ভাত।

"পত্র" শব্দযোগে বাংলায় কতকগুলি শব্দ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই বিশেষ কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের সহিত উহার ব্যবহার চলে না। গহনাপত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, জিনিষপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, খরচপত্র, দেনাপত্র, চিঠিপত্র, খাতাপত্র, চোতাপত্র, হিসাবপত্র, নিকাশপত্র, দলিলপত্র, পুঁথিপত্র, বিষয়পত্র।

পরিমাণসম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাইবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যেমন, বস্তাবস্তা, ঝুড়িঝুড়ি, মুঠামুঠা, বাক্সবাক্স, কল্সি-কল্সি, বাটিবাটি। এগুলি কেবলমাত্র আধারবাচক শব্দ সম্বন্ধেই খাটে; মাপ বা ওজন সম্বন্ধে খাটে না—গজ-গজ বা সের-সের বলা চলে না।

সময় সম্বন্ধেও বহুত্ব অর্থে শব্দদ্বৈত ঘটে—বার বার, দিন দিন, মাস মাস, ঘড়ি ঘড়ি। বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্থক দুই শব্দের যুগ্মতা ব্যবহৃত হয়, যেমন:—লোকজন, কাজকর্ম্ম, ছেলেপুলে, পাখীপাখালী, জন্তুজানোয়ার, কাঙালগরীব, রাজারাজ্ড়া বাজনা-বাদ্য। এই সকল যুগ্ম শব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু কাছাকাছি অর্থ এমন দৃষ্টান্তও আছে;—দোকানহাট, শাকসব্জি, বনজঙ্গল, মুটেমজুর, হাঁড়িকুঁড়ি। এরূপস্থলে বহুত্বের সঙ্গে কতকটা বৈচিত্র্য বুঝায়। যুগ্ম শব্দের একাংশের কোনো অর্থ নাই এমনো আছে। যেমন, কাপড়চোপড়,

বাসনকোসন, চাকরবাকর। এস্থলেও কতকটা বৈচিত্র্য অর্থ দেখা যায়।

কথিত বাংলায় "ট" অক্ষরের সাহায্যে একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত আছে। যেমন, জিনিষটিনিষ, ঘোড়াটোড়া। ইহাতে প্রভৃতি শব্দের ভাবটা বুঝায়।

১৩১৮

স্ত্রীলিঙ্গ

ভারতবর্ষের অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় শব্দগুলি অনেকস্থলে বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দিতে ভোঁ (ভ্রূ), মৃত্যু, আগ (অগ্নি), ধূপ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। সোনা, রূপা, হীরা, প্রেম, লোভ, পুংলিঙ্গ। বাংলা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক, বা উচ্চারণমূলক স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এমন কি অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গসূচক কোনো প্রত্যয় গ্রহণ করে না। সেরূপ স্থলে বিশেষভাবে স্ত্রীজাতীয়ত্ব বুঝাইতে হইলে বিশেষণের প্রয়োজন হয়। কুকুর, বিড়াল, উট, মহিষ প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দের নিয়মে ব্যবহার কালে লিখিত ভাষায় কুকুরী,

বিড়ালী, উষ্ট্রী, মহিষী হইয়া থাকে কিন্তু কথিত ভাষায় এরূপ ব্যবহার হাস্যকর।

সাধারণত ই এবং ঈ প্রত্যয় ও নি এবং নী প্রত্যয় যোগে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়। ই ও ঈ প্রত্যয় :—ছোঁড়া, ছুঁড়ি, ছোকরা, ছুকরি, খুড়া, খুড়ি, কাকা কাকি, মামা মামি, পাগ্‌লা পাগ্‌লি, জেঠা জেঠি জেঠাই, বেটা বেটি, দাদা দিদি, মেসো মাসি, পিসে পিসি, পাঁঠা পাঁঠি, ভেড়া ভেড়ি, ঘোড়া ঘুড়ি, বুড়া বুড়ি, বামন বাম্‌নি, খোকা খুকি, শ্যালা শ্যালি, অভাগা অভাগী, হতভাগা হতভাগী, বোষ্টম বোষ্টমী, নেড়া, নেড়ি।

নি ও নী প্রত্যয় :—কলু কলুনি, তেলি তেলিনি, গয়লা গয়লানি, বাঘ বাঘিনি, মালি মালিনী, ধোবা ধোবানি, নাপিত নাপ্‌তিনি, কামার কামারনি, চামার চামারনি, পুরুৎ পুরুৎনি, মেতর মেতরানি, তাঁতি তাঁতিনি, মজুর মজুরনি, ঠাকুর ঠাকুরানি (ঠাক্‌রুন), চাকর চাকরানি, হাড়ি হাড়িনি, সাপ সাপিনি, পাগল পাগলিনি, উড়ে উড়েনি, কায়েৎ কায়েৎনি, খোট্টা খোট্টানি, চৌধুরী চৌধুরাণী, মোগল মোগলানি, মুসলমান মুসলমাননি, জেলে জেলেনি, রাজপুৎ রাজপুৎনি, বেয়াই বেয়ান।

এই প্রত্যয় যোগের নিয়ম কী তাহা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এ প্রত্যয়টি কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দেই আবদ্ধ, তাহার বাহিরে প্রয়োজন হইলেও ব্যবহার হয় না। পাঞ্জাবি সম্বন্ধে পাঞ্জাবিনি, মারাঠা সম্বন্ধে মারাঠনি, গুজরাটি সম্বন্ধে গুজরাটনি প্রয়োগ নাই। উড়েনি আছে কিন্তু শিখ্‌নি মগ্‌নি মাদ্রাজিনী নাই।

ময়ূর জাতির স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দৃশ্যতঃ বিশেষ পার্থক্য থাকাতে ভাষায় ময়ূর ময়ূরী ব্যবহৃত হয় কিন্তু চিল সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার নাই।

পুরুষ মেয়ে, অথবা পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন, বাপ মা, ছেলে মেয়ে, মদ্দা মাদী, ষাঁড় গাই, বর কনে, জামাই বউ, (বউ শব্দটি পুত্রবধূ ও স্ত্রী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। সাহেব বিবি বা মেম, কর্ত্তা গিন্নি (গৃহিণী), ভূত পেত্নী, প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ আছে যাহার স্ত্রীলিঙ্গবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক রূপ স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। বাংলায় লিখিত বা কথিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কালে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গরূপ ব্যবহার হয়—কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই সহজ হইতেছে ততই ইহা কমিয়া আসিতেছে। বিষমা বিপদ, পরমা সম্পদ বা মধুরা ভাষা পরম পণ্ডিতেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন না। বিশেষত বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পরে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তখন তাহা বর্ত্তমান বাংলায় কখনই স্ত্রীলিঙ্গ হয় না—অতিক্রান্তা রজনী বলা যাইতে পারে কিন্তু রজনী অতিক্রান্তা হইল আজ কালকার দিনে কেহই লিখে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উচ্চারণমতে কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কালে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানি কিন্তু আধুনিক ভাষায় দেশ সম্বন্ধে তাহা খাটে না।

ভারতবর্ষ বা ভারত, সংস্কৃত ভাষায় কখনই স্ত্রী শ্রেণীয় শব্দ হইতে পারে না কিন্তু আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে তাহাকে ভারতমাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। বঙ্গও সেইরূপ বঙ্গমাতা। দেশকে মাতৃভাবে চিন্তা করাই প্রচলিত হওয়াতে দেশের নামকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে মানা হয় না।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণ কালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন, সিংহিনী (সিংহী), গৃধিনী (গৃধ্রী, গৃধ্র শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না), অধীনী (অধীনা,) হংসিনী (হংসী), সুকেশিনী (সুকেশী) মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী), কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), ভুজঙ্গনী (ভুজঙ্গী), হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।

বিশেষণ শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় প্রাপ্ত হয় না কিন্তু বিশেষণ পদ বিশেষ্য অর্থ গ্রহণ করিলে এ নিয়ম সর্ব্বত্র থাটে না। খোঁদী, নেকী।

ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া ই প্রত্যয় গ্রহণ করে। ঘরভাঙানিয়া (ভাঙানে) ঘরভাঙানী, মনমাতানিয়া মনমাতানী, পাড়াকুঁদুলিয়া পাড়াকুঁদুলি, কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তনী।

হিন্দিতে ক্ষুদ্রতা ও সৌকুমার্য্যবোধক ই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়—পুং গাড়া স্ত্রীং গাড়ি, পুং রস্‌সা, স্ত্রীং রস্‌সী।

বাংলায় বৃহত্ত্ব অর্থে আ ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ

হইয়া থাকে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহাদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রসা রসি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, বড়া বড়ি, ঝোলা ঝুলি, নোড়া নুড়ি, গোলা গুলি, হাঁড়া হাঁড়ি, ছোরা ছুরি, ঘুষা ঘুষি, কুপা কুপি, কড়া কড়ি. ঝোড়া ঝুড়ি, কলস কল্‌সি, জোড়া জুড়ি, ছাতা ছাতি।

কোনো কোনো স্থলে এই প্রকার রূপান্তরে কেবল ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব ভেদ বুঝায় না একেবারে দ্রব্যভেদ বুঝায়। যথা কোঁড়া (বাঁশের) কুঁড়ি (ফুলের), জাঁতা জাঁতি, বাটা (পানের) বাটি।

কিন্তু একথা বলা আবশ্যক টা ও টি, গুলা ও গুলি, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয় প্রকার শব্দেই ব্যবহৃত হয়। মেয়েগুলো ছেলেগুলি, বউটা জামাইটি ইত্যাদি।

অনুবাদ-চর্চ্চা

শান্তিনিকেতন পত্রের পাঠকদের নিকট হইতে একটি ইংরেজি অনুবাদের বাংলা তর্জ্জমা চাহিয়াছিলাম। কতকগুলি উত্তর পাইয়াছিলাম। সকল উত্তরের সমালোচনা করি এমন স্থান আমাদের নাই। ইহার মধ্যে যেটা হাতে ঠেকিল সেইটেরই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম বাক্যটি এই :—At

every stage of their growth our forest and orchard trees are subject to the attacks of hordes of insect enemies, which, if uuchecked, would soon untterly destroy them। একজন তর্জ্জমা পাঠাইয়াছেন :—"বৃদ্ধির প্রত্যেক সোপানেই আমাদের আরণ্য ও উদ্যানস্থ ফল বৃক্ষ সমূহ কীটশত্রু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, যাহারা প্রশমিত না হইলে অচিরেই তাহাদের সর্ব্বতোভাবে বিনাশসাধন করিত।"

ইংরেজি বাক্য বাংলায় তর্জ্জমা করিবার সময় অনেকেই সংস্কৃত শব্দের ঘটা করিয়া থাকেন। বাংলাভাষাকে ফাঁকি দিবার এই একটা উপায়। কারণ, এই শব্দগুলির পর্দ্দার আড়ালে বাংলা ভাষারীতির বিরুদ্ধাচরণ অনেকটা ঢাকা পড়ে। বাংলাভাষায় "যাহারা" সর্ব্বনামটি গণেশের মতো বাক্যের সর্ব্বপ্রথম পূজা পাইয়া থাকে। "দস্যুদল পুলিশের হাতে ধরা পড়িল যাহারা গ্রাম লুটিয়াছিল" বাংলায় এরূপ বলি না, আমরা বলি, "যাহারা গ্রাম লুটিয়াছিল সেই দস্যুদল পুলিসের হাতে ধরা পড়িল।" The pilgrims took shelter in the temple, most of whom were starving—ইংরেজিতে এই "whom" অসঙ্গত নহে। কিন্তু বাংলায় ঐ বাক্যটি তর্জ্জমা করিবার বেলা যদি লিখি, "যাত্রীরা মন্দিরে আশ্রয় লইল যাহাদের অধিকাংশ উপবাস করিতেছিল" তবে তাহা ঠিক শোনায় না। এরূপস্থলে আমরা "যাহারা" সর্ব্বনামের বদলে "তাহারা" সর্ব্বনাম ব্যবহার করি।

আমরা বলি "যাত্রীরা মন্দিরে আশ্রয় লইল, তাহারা অনেকেই উপবাসী ছিল"। অতএব আমাদের আলোচ্য ইংরেজি প্যারাগ্রাফে যেখানে "which" আছে সেখানে "যাহারা" না হইয়া "তাহারা" হইবে।

"যে" সর্ব্বনাম সম্বন্ধে যে নিয়মের আলোচনা করিলাম তাহার ব্যতিক্রম আছে এখানে তাহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক। "এমন" সর্ব্বনাম-শব্দানুগত বাক্যাংশ বিকল্পে "যে" সর্ব্বনামের পূর্ব্বে বসে। যথা :—"এমন গরীব আছে যাহার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।" ইহাকে উল্টাইয়া বলা চলে 'যাহার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না এমন গরীবও আছে'। 'এমন জলচর জীব আছে যাহারা স্তন্যপায়ী এবং ভাসিয়া উঠিয়া যাহাদিগকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়'। এই "এমন" শব্দ না থাকিলে বাক্যের শেষভাগে "যাহাদিগকে" শব্দ ব্যবহার করা যায় না। যেমন, "তিমি জাতীয় স্তন্যপায়ী জলে বাস করে, ভাসিয়া উঠিয়া যাহাদিগকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়"—ইহা ইংরেজি রীতি ; বাংলা রীতিতে "যাহাদিগকে" না বলিয়া "তাহাদিগকে বলিতে হইবে।

ইংরেজিতে Subject শব্দের অনেকগুলি অর্থ আছে তাহার মধ্যে একটি অর্থ, আলোচ্য প্রসঙ্গ। ইহাকেই আমরা বিষয় বলি। Subject of conversation, subject of discussion ইত্যাদির বাংলা,—আলাপের বিষয়, তর্কের বিষয়। কিন্তু Subject to cold "সর্দ্দির বিষয়" নহে। এরূপস্থলে সংস্কৃত ভাষায় আস্পদ, পাত্র, ভাজন, অধীন, বশীভূত প্রভৃতি প্রয়োগ

চলে। রোগাস্পদ, আক্রমণের পাত্র, মৃত্যুর বশীভূত ইত্যাদি প্রয়োগ চলিতে পারে।

আমাদের অনেক পত্রলেখকই subject কথাটাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন কীটশত্রু "গাছগুলিকে আক্রমণ করে"। ইহাতে আক্রমণ ব্যাপারকে নিত্য ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু subject to attack বলিলে বুঝায় এখনো আক্রমণ না হইলেও গাছগুলি আক্রমণের লক্ষ্য বটে।

ইংরেজি বাক্যটিকে আমি এইরূপ তর্জ্জমা করিয়াছি :—"আমাদের বনের এবং ফলবাগানের গাছগুলি আপন বৃদ্ধিকালের প্রত্যেক পর্ব্বে দলে দলে শত্রু কীটের আক্রমণভাজন হইয়া থাকে; ইহারা বাধা না পাইলে শীঘ্রই গাছগুলিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিত।"

"What the loss our forest and shade trees would mean to us can better be imagined than described." পত্রলেখকের তর্জ্জমা :—"বন্য ও ছায়াপাদপের ক্ষতি বলিতে কতটা ক্ষতি আমাদের বোধগম্য হয় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা আমাদের অধিক উপলব্ধির বিষয়।"

"বর্ণনা করা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধির বিষয়" এরূপ প্রয়োগ চলে না। একটা কিছু 'করার' তুলনা চাই। 'বর্ণনা করা অপেক্ষা উপলব্ধি করা সহজ' বলিলে ভাষায় বাধিত না বটে কিন্তু উপলব্ধি করা এবং imagine করা এক নহে।

আমাদের তর্জ্জমা :—"আমাদের বন-বৃক্ষ এবং ছায়াতরুগুলির

বিনাশ বলিতে যে কতটা বুঝায় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা কল্পনা করা সহজ।"

"Wood enters into so many products, that it is difficult to think of civilised man without it, while the fruits of the orchards are of the greatest importance."

পত্রলেখকের তর্জ্জমা :—"কাষ্ঠ হইতে এত দ্রব্য উৎপন্ন হয় যে, সভ্য মানবের পক্ষে উহাকে পরিহার করিবার চিন্তা অত্যন্ত কঠিন, এদিকে অমাদের উদ্যানজাত ফলসমূহও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।"

কাষ্ঠ হইতে দ্রব্য নিৰ্ম্মিত হয়, উৎপন্ন হয় না। এখানে 'উহাকে' শব্দের 'কে' বিভক্তিচিহ্ন চলিতে পারে না। 'ফল সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়' বলিলে অত্যুক্তি করা হয়। ইংরেজিতে "are of the greatest importance" বলিতে এই বুঝায় যে পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা যে সকল জিনিষের আছে, ফলও তাহার মধ্যে একটি। 'সভ্য মানুষের পক্ষে উহাকে পরিহার করিবার চিন্তা অত্যন্ত কঠিন' ইহা মূলের অনুগত হয় নাই।

আমাদের তর্জ্জমা :—"কাঠ আমাদের এত প্রকার সামগ্রীতে লাগে যে ইহাকে বাদ দিয়া সভ্য মানুষের অবস্থা চিন্তা করা কঠিন; এদিকে ফলবাগানের ফলও আমাদের যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়।"

বলা বাহুল্য 'যার-পর-নাই' কথাটা শুনিতে যত একান্ত বড়ো ব্যবহারে ইহার অর্থ তত বড়ো নহে।

"Fortunately, the insect foes of trees are not without their own persistent enemies, and among them are many species of birds, whose equipment and habits specially fit them to deal with insects and whose entire lives are spent in pursuit of them."

পত্রলেখকের তর্জ্জমা :—'সৌভাগ্যক্রমে বৃক্ষের কীট-অরিগণও নিজেরা তাহাদের স্থায়ী শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত নয়, এবং তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে, যাহাদিগকে তাহাদের অভ্যাস ও দৈহিক উপকরণগুলি বিশেষভাবে কীটদিগের সহিত সংগ্রামে উপযোগী করিয়াছে এবং যাহাদিগের সমস্ত জীবন তাহাদিগকে অনুধাবন করিতে ব্যয়িত হয়।'

'যে' সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমাদের বক্তব্য জানাইয়াছি।

আমাদের তর্জ্জমা :—'ভাগ্যক্রমে বৃক্ষের শত্রু কীট সকলেরও নিজেদের নিত্য শত্রুর অভাব নাই; এই শত্রুদের মধ্যে এমন অনেক জাতীয় পাখী আছে যাহাদের যুদ্ধোপকরণ এবং অভ্যাস সকল কীট-আক্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যাহারা কীট শীকারেই সমস্ত জীবন যাপন করে।'

ইংরেজিতে persistent কথাটি নিতান্ত সহজ। কথ্য

বাংলায় আমরা বলি নাছোড়বান্দা। কিন্তু লেখায় সব জায়গায় ইহা চলে না। আমাদের একজন পত্রলেখক 'দৃঢ়াগ্রহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'আগ্রহ' শব্দে, অন্তত বাংলায়, প্রধানত একটি মনোধর্ম্ম বুঝায়। নিষ্ঠা শব্দেও সেইরূপ। Persistent শব্দের অর্থ, যাহা নিরন্তর লাগিয়াই আছে। 'নির্ব্বন্ধ' শব্দটিতে সেই লাগিয়া থাকা অর্থ আছে; 'দৃঢ়নির্ব্বন্ধ' কথাটা বড়ো বেশি অপরিচিত। এখানে কেবলমাত্র নিত্য বিশেষণ যোগে ইংরেজি শব্দের ভাব স্পষ্ট হইতে পারে।

আমাদের আলোচ্য ইংরেজি প্যারাগ্রাফে একটি বাক্য আছে 'among them are many species of birds';—আমাদের একজন ছাত্র এই species শব্দকে 'উপজাতি' প্রতিশব্দ দ্বারা তর্জ্জমা করিয়াছে। গতবারে 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধে আমরাই speciesএর বাংলা 'উপজাতি' স্থির করিয়াছিলাম অথচ আমরাই এবারে কেন many 'species of birds'কে 'নানাজাতীয় পক্ষী' বলিলাম তাহার কৈফিয়ৎ আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে এখানে ইংরেজিতে species পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। এখানে কোনো বিশেষ একটি মহাজাতীয় পক্ষীরই উপজাতিকে লক্ষ্য করিয়া species কথা বলা হয় নাই। বস্তুত কীটের যে সব শত্রু আছে তাহারা নানা জাতিরই পক্ষী—কাকও হইতে পারে শালিকও হইতে পারে, শুধু কেবল কাক এবং দাঁড়-কাক শালিক এবং গাঙশালিক নহে। বস্তুত সাধারণ ব্যবহারে

অনেক শব্দ আপন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া চলে, কেহ তাহাতে আপত্তি করে না,—কিন্তু পারিভাষিক ব্যবহারে কঠোরভাবে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যেমন বন্ধুর নিমন্ত্রণক্ষেত্রে মানুষ নিয়মের দিকে দৃষ্টি রাখে না, সামাজিক নিমন্ত্রণে তাহাকে নিয়ম বাঁচাইয়া চলিতে হয়—এও সেইরূপ।

আমাদের তর্জ্জমায় আমরা অর্থ স্পষ্ট করিবার খাতিরে দুই একটা বাড়তি শব্দ বসাইয়াছি। যেমন শেষ বাক্যে মূলে যেখানে আছে, 'and among them are many species of birds,' আমরা লিখিয়াছি 'এই শত্রুদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে'—অবিকল অনুবাদ করিলে লিখিতে হইত 'এবং তাহাদের মধ্যে ইত্যাদি।' ইংরেজিতে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, সর্ব্বনাম শব্দ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিকটতম বিশেষ্য শব্দের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এস্থলে them সর্ব্বনামের অনতিপূর্ব্বেই আছে enemies, এইজন্য এখানে 'তাহাদের' বলিলেই শত্রুদের বুঝাইবে। বাংলায় এ নিয়ম পাকা নহে, এইজন্য, 'তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে' বলিলে যদি কেহ হঠাৎ বুঝিয়া বসেন, 'গাছেদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে, অর্থাৎ পক্ষী বাসা বাঁধিয়া থাকে' তবে তাঁহাকে খুব দোষী করা যাইবে না।

ইংরেজিতে 'and', আর বাংলায় এবং শব্দের প্রয়োগ ভেদ আছে। সেটা এখানে বলিয়া লই। 'তাহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তাহারা খবরের কাগজে তাঁহার নিন্দা করে' এই বাক্যটা ইংরেজি ছাঁচের হইল। এস্থলে আমরা 'এবং,

-ব্যবহার করি না। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তাহারা সরকারের বেতন ভোগী।' এখানেও 'এবং' বাংলায় চলে না। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না' এরূপস্থলে হয় 'এবং' বাদ দিই অথবা 'কিন্তু' বসাই। তাহার কারণ, 'আছে'র সঙ্গে 'আছে', 'করে'র সঙ্গে 'করে,' 'হয়'-এর সঙ্গে 'হয়', মেলে, 'আছে'র সঙ্গে 'করে','করে'র সঙ্গে 'হয়' মেলে না।'তাঁহার শত্রু আছে এবং তাঁহার তিনটে মোটর গাড়ি আছে'—এই দুটি অসংশ্লিষ্ট সংবাদের মাঝ-খানেও 'এবং' চলে কিন্তু 'তাঁহার শত্রু আছে এবং তিনি সৌখীন লোক' এরূপ স্থলে 'এবং' চলে না, কেননা 'তাঁর আছে' এবং 'তিনি হন' এদুটো বাক্যের মধ্যে ভাষার গতি দুইদিকে। এগুলো যেন ভাষার অসবর্ণ বিবাহ, ইংরেজিতে চলে বাংলায় চলে না। ইংরেজির সঙ্গে বাংলার এই সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি অনেক সময় অসতর্ক হইয়া আমরা ভুলিয়া যাই।

And শব্দযুক্ত ইংরেজি বাক্যে তর্জ্জমা করিতে গিয়া বারবার দেখিয়াছি তাহার অনেক স্থলেই বাংলায় 'এবং' শব্দ খাটে না। তখন আমার এই মনে হইয়াছে 'এবং' শব্দটা লিখিত বাংলায় পণ্ডিতদের কর্ত্তৃক নূতন আমদানী, ইহার মানে 'এইরূপ'। 'আর' শব্দ 'অপর' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহার মানে 'অন্যরূপ'। 'তাঁহার ধন আছে এবং মান আছে' বলিলে বুঝায় তাঁহার যেমন ধন আছে সেইরূপ মানও আছে। "তিনি প'ড়ে গেলেন, আর, একটা গাড়ী তাঁর পায়ের উপর দিয়ে

চলে গেল'—এখানে পড়িয়া যাওয়া একটা ঘটনা, অন্য ঘটনাটা অপর প্রকারের, সেই জন্য "আর" শব্দটা খাটে। 'তিনি পড়িয়া গেলেন এবং আঘাত পাইলেন' এখানে দুইটি ঘটনার প্রকৃত যোগ আছে। 'তিনি পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল,' এখানে 'এবং' শব্দটা বেখাপ। এরূপ বেখাপ প্রয়োগ কেহ করেন না বা আমি করি না এমন কথা বলি না কিন্তু ইহা যে বেখাপ তাহার উদাহরণ গতবারের শান্তিনিকেতন পত্রে কিছু কিছু দিয়াছি। "He has enemies and they are paid by the Government" ইহার বাংলা, 'তাঁর শত্রু আছে; তারা সরকারের বেতন খায়'। এখানে 'এবং' কথাটা অচল। তার কারণ, এখানে দুই ঘটনা দুইরূপ। 'তাঁহার পুত্র আছে এবং কন্যা আছে।' 'তাঁহার গাড়ি আছে এবং ঘোড়া আছে'। এসব জায়গায় 'এবং' জোরে আপন আসন দখল করে।

আশ্বিন কার্ত্তিকের সংখ্যার শান্তিনিকেতনে বলিয়াছিলাম যে "এবং" শব্দ দিয়া যোজিত দুই বাক্যাংশের মধ্যে ক্রিয়াপদের রূপের মিল থাকা চাই। যেমন "সে দরিদ্র এবং সে মূর্খ" "সে চরকা কাটে এবং ধান ভানে",—প্রথম বাক্যটির দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষের বাক্যটির দুই অংশই কর্ত্তৃত্ববাচক। "সে দরিদ্র এবং সে ধান ভানিয়া খায়" আমার মতে এটা খাঁটি নহে। আমরা এরূপ স্থলে "এবং" ব্যবহারই করি না, বলি, 'সে দরিদ্র ধান ভানিয়া খায়'। অথচ ইংরেজিতে অনায়াসে বলা চলে, She is poor and lives on husking rice.

"রাম ধনী এবং তার বাড়ী তিনতলা" এরূপ প্রয়োগ আমরা সহজে করি না। আমরা বলি, "রাম ধনী, তার বাড়ী তিন তলা।"

"যার জমী আছে এবং সেই জমী যে চাষ করে এমন গৃহস্থ এই গ্রামে নেই"—এরূপ বাক্য বাংলায় চলে। বস্তুত এখানে "এবং" উহ্য রাখিলে চলেই না। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে 'এমন' শব্দটি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত শব্দগুলিকে জমাট করিয়া দিয়াছে। এমন, কেমন? না, যার-জমি-আছে-এবং-সেই-জমি-যে-নিজে-চাষ-করে"—সমস্তটাই গৃহস্থ শব্দের এক বিশেষণ পদ। কিন্তু "তিনি স্কুল মাষ্টার এবং তাঁর একটি খোঁড়া কুকুর আছে" বাংলায় এখানে "এবং" খাটে না, তার কারণ এখানে দুই বাক্যাংশ পৃথক, তাহাদের মধ্যে রূপের ও ভাবের ঘনিষ্ঠতা নাই। আমরা বলি, "তিনি স্কুল মাষ্টার, তাঁর একটি খোঁড়া কুকুর আছে।" কিন্তু ইংরেজিতে বলা চলে, He is a school master and he has a lame dog।

সংস্কৃত ভাষায় যে সব জায়গায় দ্বন্দ্ব সমাস খাটে, চলিত বাংলায় আমরা সেখানে যোজক শব্দ ব্যবহার করি না। আমরা বলি, হাতি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে রাজা চলেছেন" "চৌকী টেবিল আলনা আলমারিতে ঘরটি ভরা।" ইংরেজিতে উভয় স্থলেই একটা and না বসাইয়া চলে না। যথা The king marches with his elephants, horses and, soldiers." "The room is full of chairs, tables, clothes, racks and almirahs.

বাংলায় আর একটি নূতন আমদানি যোজক শব্দ "ও"। লিখিত বাংলায় পণ্ডিতেরা ইহাকে "and" শব্দের প্রতিশব্দরূপে গায়ের জোরে চালাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মুখের ভাষায় কখনোই এরূপ ব্যবহার খাটে না। আমরা বলি "রাজা চলেছেন, তাঁর সৈন্যও চলেছে।" "রাজা চলিয়াছেন ও তাঁহার সৈন্যদল চলিয়াছে" ইহা ফোর্ট উইলিয়মের গোরাদের আদেশে পণ্ডিতদের বানানো বাংলা। এখন "ও" শব্দের এইরূপ বিকৃত ব্যবহার বাংলা লিখিত ভাষায় এমনি শিকড় গাড়িয়াছে যে তাহাকে উৎপাটিত করা আর চলিবে না। মাঝে হইতে খাঁটি বাংলা যোজক "আর" শব্দকে পণ্ডিতেরা বিনা অপরাধে লিখিত বাংলা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আমরা মুখে বলিবার বেলা বলি "সে চলেছে, আর কুকুরটি পিছন পিছন চলেছে," অথবা "সে চলেছে, তার কুকুরটিও পিছন পিছন চলেছে" কিন্তু লিখিবার বেলা লিখি "সে চলিয়াছে ও (কিম্বা এবং) তাহার কুকুরটি তাহার অনুসরণ করিতেছে।" "আর" শব্দটিকে কি আর একবার তার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিবার সময় হয় নাই? একটা সুখের কথা এই যে, পণ্ডিতদের আশীর্ব্বাদ সত্ত্বেও "এবং" শব্দটা বাংলা কবিতার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই।

চিহ্ন বিভ্রাট

(পত্র)

"সঞ্চয়িতা"-র মুদ্রণভার ছিল যাঁর 'পরে, প্রুফ দেখার কালে চিহ্ন ব্যবহার নিয়ে তাঁর খটকা বাধে। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার যে-চিঠি চলেছিল সেটা প্রকাশ করবার যোগ্য ব'লে মনে করি। আমার মতই-যে সকলে গ্রহণ করবেন এমন স্পর্দ্ধা মনে রাখিনে। আমিও-যে সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিজের মতে চলব এত বড়ো সাহস আমার নেই। আমি সাধারণত যে-সাহিত্য নিয়ে কারবার করি পাঠকের মনোরঞ্জনের উপর তার সফলতা নির্ভর করে। পাঠকের অভ্যাসকে পীড়ন করলে তার মন বিগড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটা রসগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। তাই চল্‌তি রীতিকে বাঁচিয়ে চলাই মোটের উপর নিরাপদ। তবুও "সঞ্চয়িতা"-র প্রুফে যতটা আমার প্রভাব খাটাতে পেরেছি ততটা চিহ্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত বজায় রাখবার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। মতটা কী দুখানা পত্রেই তা বোঝা যাবে। এই মত সাধারণের ব্যবহারে লাগবে এমন আশা করিনে কিন্তু এই নিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তি হয়তো উপাদেয় হোতে

পারে। এখানে "উপাদেয়" শব্দটা ব্যবহার করলুম ইণ্টারেষ্টিং শব্দের পরিবর্ত্তে। এই জায়গাটাতে খাটল কিন্তু সর্ব্বত্রই-যে খাটবে এমন আশা করা অন্যায়। "মানুষটি উপাদেয়" বললে ব্যাঘ্রজাতির সম্পর্কে এবাক্যের সার্থকতা মনে আসতে পারে। এস্থলে ভাষায় বলি, লোকটি মজার, কিম্বা চমৎকার, কিম্বা দিব্যি। তাতেও অনেক সময়ে কুলোয় না, তখন নতুন শব্দ বানাবার দরকার হয়। বলি, বিষয়টি আকর্ষক, কিম্বা লোকটি আকর্ষক। 'আগ্রহক' শব্দও চালানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়। মনোগ্রাহী শব্দও যথাযোগ্য স্থানে চলে—কিন্তু সাধারণত ইণ্টারেষ্টিং বিশেষণের চেয়ে এ বিশেষণের মূল্য কিছু বেশি। কেননা, অনেক সময়ে ইণ্টারেষ্টিং শব্দ দিয়ে দাম চোকানো, পারা-মাখানো আধ্‌লা পয়সা দিয়ে বিদায় করার মতো। বাঙালির গান শুনে ইংরেজ যখন বলে, "হাউ ইণ্টারেষ্টিং" তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠা মূঢ়তা। যে-শব্দের এত ভিন্নরকমের দাম অন্য ভাষার ট্যাঁকশালে তার প্রতিশব্দ দাবি করা চলে না। সকল ভাষার মধ্যেই গৃহিণীপনা আছে। সব সময়ে প্রত্যেক শব্দ সুনির্দ্দিষ্ট একটিমাত্র অর্থ ই-যে বহন করে তা নয়। সুতরাং অন্য ভাষায় তার একটিমাত্র প্রতিশব্দ খাড়া করবার চেষ্টা বিপত্তিজনক। "ভরসা" শব্দের একটা ইংরেজি প্রতিশব্দ courage, আর একটা expectation। আবার কোনো কোনো জায়গায় দুটো অর্থ ই একত্র মেলে, যেমন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।

এখানে courage বটে hopeও বটে। সুতরাং এটাকে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে হোলে ও দুটোর একটাও চল্‌বে না। তখন বল্‌তে হবে—

Keep firm the faith, my heart,
it must come to happen.

উল্টে বাংলায় তর্জ্জমা করতে হোলে "বিশ্বাস" শব্দের ব্যবহারে কাজ চলে বটে কিন্তু "ভরসা" শব্দের মধ্যে যে একটা তাল ঠোকার আওয়াজ পাওয়া যায় সেটা থেমে যায়।

ইংরেজি শব্দের তর্জ্জমায় আমাদের দাসভাব প্রকাশ পায় যখন একই শব্দের একই প্রতিশব্দ খাড়া করি। যথা "সিম্প্যাথির" প্রতিশব্দে সহানুভূতি ব্যবহার। ইংরেজিতে সিম্প্যাথি কোথাও বা হৃদয়গত কোথাও বা বুদ্ধিগত। কিন্তু সহানুভূতি দিয়েই দুই কাজ চালিয়ে নেওয়া কৃপণতাও বটে হাস্যকরতাও বটে। "এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে" বল্‌লে মানতে হয় যে প্রস্তাবের অনুভূতি আছে। ইংরেজি শব্দটাকে সেলাম করব কিন্তু অতটা দূর পর্য্যন্ত তার তাঁবেদারি করতে পারব না। আমি বলব "তোমার প্রস্তাবের সমর্থন করি।"

এক কথা থেকে আরেক কথা উঠে পড়ল। তাতে কি ক্ষতি আছে। যাকে ইংরেজিতে বলে essay, আমরা বলি প্রবন্ধ, তাকে এমনতরো অবন্ধ করলে সেটা আরামের হয় ব'লে আমার

ধারণা। নিরামিষভোজীকে গৃহস্থ পরিবেষণ করবার সময় ঝোল আর কাঁচকলা দিয়ে মাছটা গোপন করতে চেয়েছিল হঠাৎ সেটা গড়িয়ে আসবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে গেল, নিরামিষ পংক্তিবাসী ব্যাকুল হয়ে ব'লে উঠল "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।"

তোমাদের কোনো কোনো লেখায় এই রকম আপ্‌সে-আনে-ওয়ালাদের নির্ব্বিচারে পাতে পড়তে দিয়ো, নিশ্চিত হবে উপাদেয়, অর্থাৎ ইণ্টারেষ্টিং। এবার পত্র দুটোর প্রতি মন দেও। এইখানে বলে রাখি, ইংরেজিতে যে-চিহ্নকে অ্যাপস-ট্রফির চিহ্ন বলে কেউ কেউ বাংলা পারিভাষিকে তাকে বলে "ইলেক", এ আমার নতুন শিক্ষা। এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি দায়িক নই। এই পত্রে উক্ত শব্দের ব্যবহার আছে।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২।

২

একদা আমার মনে তর্ক উঠেছিল যে, চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিষ, সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে ভর ক'রে চললে পায়ের পরে নির্ভর কমে। প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গীদ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধি করত। এখন তার এত বেশি নোকর চাকর কেন। ইংরেজের ছেলে যখন দেশে থাকে তখন একটিমাত্র দাসীতেই তার সব কাজ চলে যায়, ভারতবর্ষে এলেই তার চাপরাসী হরকরা বেহারা বাট্‌লার চোপদার জমাদার মালী মেথর ইত্যাদি কত কী। আমাদের লিখিত ভাষাকেও এইরকম হাকিমী সাহেবিয়ানায় পেয়ে বসেছে। "কে হে তুমি" বাক্যটাই নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকিয়ে চলেছে তবে কেন ওর পিছনে আবার একটা কুঁজ-ওয়ালা সহিস। সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে বিস্ময়ের চিহ্ন। কেননা বিস্ময় হচ্ছে একটা হৃদয় ভাব— লেখকের ভাষায় যদি সেটা স্বতই প্রকাশিত না হয়ে থাকে তাহোলে একটা চিহ্ন ভাড়া করে এনে দৈন্য ঢাকবে না। ও যেন আত্মীয়ের মৃত্যুতে পেশাদার শোকওয়ালির বুক-চাপড়ানি।

"অহো, হিমালয়ের কী অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য।" এর পরে কি ঐ ফোঁটা-সওয়ারি দাঁড়িটার আকাশে তর্জ্জনী নির্দ্দেশের দরকার আছে—(রোসো, প্রশ্নচিহ্নটা এখানে না দিলে কি তোমার ধাঁধা লাগবে (?)। কে, কি, কেন, কার, কিসে, কিসের, কত, প্রভৃতি এক ঝাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নের খোসামুদি করা কেন। "তুমি তো আচ্ছা লোক" এখানে "তো"—ইঙ্গিতের পিছনে আরো একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্‌ল্ চমক খাওয়ানোর দরকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোর। "রোজ রোজ যে দেরি ক'রে আসো" এই বাক্যবিন্যাসেই কি নালিশের যথেষ্ট জোর পৌঁছল না। যদি মনে করো অর্থটা স্পষ্ট হোলো না তাহোলে শব্দযোগে অভাব পূরণ করলে ভাষাকে বৃথা ঋণী করা হয় না,—যথা, "রোজ রোজ বড়ো-যে দেরি করে আসো।" মুস্কিল এই যে, পাঠককে এমনি চিহ্ন-মৌতাতে পেয়ে বসেছে, ওগুলো না দেখলে তার চোখের তার্ থাকে না। লঙ্কাবাটা দিয়ে তরকারী তো তৈরি হয়েছেই কিন্তু সেই সঙ্গে একটা আস্ত লঙ্কা দৃশ্যমান না হোলে চোখের ঝালে জিভের ঝালে মিলনাভাবে ঝাঁঝটা ফিকে বোধ হয়।

ছেদ চিহ্নগুলো আর এক জাতের। অর্থাৎ যতি-সঙ্কেতে পূর্ব্বে ছিল দণ্ডহাতে একাধিপত্য-গর্ব্বিত সীধে দাঁড়ি—কখনো বা একলা কখনো দোকলা। যেন শিবের তপোবনদ্বারে নন্দীর তর্জ্জনী। এখন তার সঙ্গে জুটে গেছে বাঁকা বাঁকা ক্ষুদে ক্ষুদে

অনুচর। কুকুরবিহীন সঙ্কুচিত ল্যাজের মতো। যখন ছিল না তখন পাঠকের আন্দাজ ছিল পাকা, বাক্যপথে কোথায় কোথায় বাঁক তা সহজেই বুঝে নিত। এখন কুঁড়েমির তাগিদে বুঝে'ও বোঝে না। সংস্কৃত নাটকে দেখেছ রাজার আগে আগে প্রতিহারী চলে—চিরাভ্যস্ত অন্তঃপুরের পথেও ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে ওঠে, "এই দিকে" "এই দিকে"। কমা সেমিকোলনগুলো অনেকটা তাই।

একদিন চিহ্নপ্রয়োগে মিতব্যয়ের বুদ্ধি যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল তখনই আমার কাব্যের পুনসংস্করণকালে বিস্ময়সঙ্কেত ও প্রশ্নসঙ্কেত লোপ করতে বসেছিলুম। প্রৌঢ় যতিচিহ্ন সেমিকোলনকে জবাব দিতে কুন্ঠিত হই নি। কিশোর কমা-কে ক্ষমা করেছিলুম, কারণ, নেহাৎ খিড়কির দরজায় দাঁড়ির জমাদারী মানানসই হয় না। লেখায় দুই জাতের যতিই যথেষ্ট, একটা বড়ো একটা ছোটো। সূক্ষ্ম বিচার ক'রে আরো একটা যদি আনো তাহোলে অতি সূক্ষ্ম বিচার ক'রে ভাগ আরো অনেক বাড়বে না কেন।

চিহ্নের উপর বেশি নির্ভর যদি না করি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হোতে হয়। মনে করো কথাটা এই :—"তুমি যে **বাবুয়ানা** সুরু করেছ।" এখানে বাবুয়ানার উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয়—ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন—পূরিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, "তুমি যে বাবুয়ানা সুরু করেছ তার মানেটা কী বলো দেখি।" "যে" অব্যয় পদের পরে ঠেস দিলে

বিস্ময় প্রকাশ পায়। "তুমি যে বাবুয়ানা স্থরু করেছ।" প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সারা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তাহোলে ভাষাটাকেই নিঃসন্দিগ্ধ ক'রে তুলতে হয়। তাহোলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে শুধরিয়ে বলতে হয়—"যে-বাবুয়ানা তুমি স্থরু করেছ।"

এইখানে আর একটা আলোচ্য কথা আছে। প্রশ্ন-সূচক অব্যয় "কি" এবং প্রশ্নবাচক সর্ব্বনাম "কি" উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত। আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার স্থবিধা হয়। "তুমি কি রাঁধছ" "তুমি কী রাঁধছ"—বলা বাহুল্য এদুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধছ কিনা, এবং তুমি কোন্ জিনিষ রাঁধছ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে। যদি দুই "কি"-এর জন্যে দুই ইকারের বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাকো তাহোলে হাইফেন্ ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত :— "তুমি-কি রাঁধ্‌ছ" এবং "তুমি কি-রাঁধ্‌ছ।" এই পর্য্যন্ত থাক্। ইতি ৫ নবেম্বর, ১৯৩১। *

* পরে দেখা গেছে, কি এবং কী-এর বিশেষ প্রয়োগ পুরোনো বাংলা পুঁথি-তেও প্রচলিত আছে।

আমার প্রুফ-সংশোধনপ্রণালী দেখলেই বুঝতে পারবে আমি নিরঞ্জনের উপাসক—চিহ্নের অকারণ উৎপাত সইতে পারিনে। কেউ কেউ যাকে ইলেক্ বলে (কোন্ ভাষা থেকে পেলে জানিনে) তার ঔদ্ধত্য হাস্যকর অথচ দুঃসহ। অসমাপিকা ক'রে ব'লে প্রভৃতিতে দরকার হোতে পারে কিন্তু "হেসে" "কেঁদে"-তে একেবারেই দরকার নেই। "করেছে বলেছে"-তে ইলেক চড়িয়ে পাঠকের চোখে খোঁচা দিয়ে কী পুণ্য অর্জ্জন করবে জানিনে। করবে চলবে প্রভৃতি স্বতঃসম্পূর্ণ শব্দগুলো কী অপরাধ করেছে যে, ইলেককে শিরোধার্য্য করতে তারা বাধ্য হবে। "যার"—"তার" উপর ইলেক চড়াওনি ব'লে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাছে হল (লাঙ্গল) এবং হল (হইল) শব্দে অর্থ নিয়ে ফৌজদারী হয় সেজন্যে ইলেকের বাঁকা বুড়ো আঙুল না দেখিয়ে অকপটচিত্তে হোলো লিখতে দোষ কী। এ ক্ষেত্রে ঐ ইলেকের ইসারাটার কী মানে তা সকলের তো জানা নেই। হোলো শব্দে দুটো ওকার ধ্বনি আছে—এক ইলেক কি ঐ দুটো অবলাকেই অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত করেছেন। হতে ক্রিয়াপদ যে-অর্থ স্বভাবতই বহন করে তা ছাড়া আর কোনো অর্থ তারপরে আরোপ করা বঙ্গভাষায় সম্ভব কি না জানিনে অথচ ঐ ভালোমানুষকে দাগীরূপে চিহ্নিত

করা ওর কোন্ নিয়তির নির্দ্দেশে। স্তম্ভপরে পালঙ্কপরে প্রভৃতি শব্দ কানে শোনবার সময় কোনো বাঙালির ছেলে ইলেকের অভাবে বিপন্ন হয় না, পড়বার সময়েও স্তম্ভ পালঙ্ক প্রভৃতি শব্দকে দিন মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালার্থক শব্দ বলে কোনো প্রকৃতিস্থ লোকের ভুল করবার আশঙ্কা নেই। "চলবার" "বলবার" "মরবার" "ধরবার" শব্দগুলি বিকল্পে দ্বিতীয় কোনো অর্থ নিয়ে কারবার করে না তবু তাদের সাধুত্ব রক্ষার জন্যে ল্যাজগুটোনো ফোঁটার ছাপ কেন। তোমার প্রুফে দেখলুম "হ্য়ে" শব্দটা বিনা চিহ্নে সমাজে চলে গেল অথচ "ল'য়ে" কথাটাকে ইলেক দিয়ে লজ্জিত করেছ। পাছে সঙ্গীতের লয় শব্দটার অধিকারভেদ নিয়ে মামলা বাধে এই জন্যে। কিন্তু সে রকম সুদূর সম্ভাবনা আছে কি। লাখে যদি একটা সম্ভাবনা থাকে তারি জন্যে কি হাজার হাজার নিরপরাধকে দাগা দেবে। কোন্ জায়গায় এ রকম বিপদ ঘটতে পারে তার নমুনা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। যেখানে যুক্ত ক্রিয়াপদে অসমাপিকা থাকে সেখানে তার অসমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। যেমন, বলে ফেল, করে দাও ইত্যাদি। অবশ্য করে দাও মানে হাতে দাও হতেও পারে কিন্তু সমগ্র বাক্যের যোগে সে রকম অর্থবিকল্প হয় না—যেমন কাজ করে দাও। "বলে ফেল" কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখলে আর একটা মানে কল্পনা করা যায়, কেউ একজন বলে, "ফেলো"। কিন্তু আমরা তো সব প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের টুকরো কথার ব্যবসায়ী নই। "তুমি বলে যাও" কথাটা স্বতই স্পষ্ট, কেবল

দুর্দ্দৈবক্রমে, তুমি বল্ নাচে যাও এমন মানে হোতেও পারে সেই কচিৎ দুর্যোগ এড়াবার জন্যে eternal punishment কি দয়া কিম্বা ন্যায়ের পরিচায়ক। "দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন"—সমস্ত বাংলা দেশে যত পাঠশালায় যত ছেলে আছে পরীক্ষা করে দেখো একজনেরও ইলেকের দরকার হয় কি না, তবে কেন তুমি না-হক্ মুদ্রাকরকে পীড়িত করলে। তোমার প্রুফে তুমি ক্ষুদে ক্ষুদে চিহ্নের ঝাঁকে আমার কাব্যকে এমনি আচ্ছন্ন করেছ যে তাদের জন্য মশারি ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার প্রুফে আমি এর একটাও ব্যবহার করিনি—কেননা, জানি বুঝতে কানাকড়ি পরিমাণও বাধে না। জানি আমার বইয়ে নানা বানানে চিহ্নপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্য ঘটেছে—তা নিয়েও আমি মাথা বকাইনে—যেখানে দেখি অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে সেখানে ছাড়া এইদিকে আমি দৃকপাতও করিনে। প্রুফে যত অনাবশ্যক সংশোধন বাড়াবে ভুলের সম্ভাবনা ততই বাড়বে—সময় নষ্ট হবে, তার বদলে লাভ কিছুই হবে না। ততো যতো শব্দে ওকার নিতান্ত অসঙ্গত। মতো সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। মোটের উপর আমার বক্তব্য এই পাঠককে গোড়াতেই পাগল নির্ব্বোধ কিম্বা আহেলাবেলাতি বোলে ধরে নিয়ো না—যেখানে তাদের ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে কেবলি তাদের চোখে আঙুল দিয়ো না—চাণক্যের মতো চিহ্নের কুশাঙ্কুরগুলো উৎপাটিত কোরো তাহোলে বানানভীরু শিশুদের যিনি বিধাতা তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করবে।

আমি যে নির্ব্বিচারে চিহ্নস্থূয়যজ্ঞের জনমেজয়গিরি করতে বসেছি তা মনে করো না। কোনো কোনো স্থলে হাইফেন চিহ্নটার প্রয়োজন স্বীকার করি। অব্যয় "যে" এবং সর্ব্বনাম "যে" শব্দের প্রয়োগভেদ বোঝাবার জন্যে আমি হাইফেনের শরণাপন্ন হই। "তুমি যে কাজে লেগেছ" বল্‌তে বোঝায় তুমি অকর্ম্মণ্য নও, এখানে "যে" অব্যয়। "তুমি যে কাজে লেগেছ" এখানে কাজকে নির্দ্দিষ্ট করবার জন্য "যে" সর্ব্বনাম বিশেষণ। প্রথম "যে" শব্দে হাইফেন দিয়ে "তুমি"-র সঙ্গে ও দ্বিতীয় "যে"-কে "কাজ" শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ স্পষ্ট হয়। অন্যত্র দেখো,—"তিনি বললেন যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েছে।" এখানে "যে" অব্যয়। অথবা তিনি বল্‌লেন "যে আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েছে।" এখানে "যে" সর্ব্বনাম, আপিসের বিশেষণ। হাইফেন চিহ্নে অর্থভেদ স্পষ্ট করা যায়। যথা, "তিনি বল্‌লেন-যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েছে।" এবং "তিনি বল্‌লেন যে-আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েছে।"

১৯৩১

নিচ ও নীচ

(পত্রাংশ)

নীচ শব্দ সংস্কৃত, তাহার অর্থ mean। বাংলায় যে "নিচে" কথা আছে তাহা ক্রিয়ার বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় নীচ শব্দের ক্রিয়ার বিশেষণরূপ নাই। সংস্কৃতে নিম্নতা বুঝাইবার জন্য নীচ কথার প্রয়োগ আছে কিনা জানি না। হয়তো উচ্চ নীচ যুগ্ম শব্দে এরূপ অর্থ চলিতে পারে—কিন্তু সে স্থলেও যথার্থত নীচ শব্দের তাৎপর্য্য moral, তাহা physical নহে। অন্তত আমার সেই ধারণা। সংস্কৃতে নীচ ও নিম্ন দুই ভিন্ন বর্গের শব্দ—উহাদিগকে একার্থক করা যায় না। এই জন্য বাংলায় নীচে বানান করিলে below না বুঝাইয়া to the mean বুঝানোই সঙ্গত হয়। আমি সেইজন্য "নিচে" শব্দটিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলা বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রাচীন প্রাকৃতে বানানে যে রীতি আছে আমার মতে তাহাই শুদ্ধ রীতি ; ছদ্মবেশে মর্য্যাদা ভিক্ষা অশ্রদ্ধেয়। প্রাচীন বাংলায় পণ্ডিতেরাও সেই নীতি রক্ষা করিতেন, নব্য পণ্ডিতদের হাতে বাংলা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে।

৯ অক্টোবর, ১৯৩৪

কাল্‌চার ও সংস্কৃতি

(সঙ্কলিত)

কাল্‌চার্ শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে ; চোখে পড়েছে কি ? কৃষ্টি ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে ? এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কাম্‌ড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কাম্‌ড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা ?

অন্য প্রদেশে ভদ্রতাবোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার "সংস্কৃতি"। যে-মানুষের কাল্‌চার আছে তাকে বলা চলে সংস্কৃতিমান, শব্দটাকে বিশেষ্য করে যদি বলা যায় সংস্কৃতি-মত্তা, ওজনে ভারি হয় বটে কিন্তু রোমহর্ষক হয় না। নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তবু আন্দাজে বলতে পারি, বন্ধুরা আমাকে কাল্‌চার্‌ড্ ব'লেই গণ্য করেন। কিন্তু যদি তাঁরা আমাকে সহসা কৃষ্টিমান উপাধি দেন বা আমার কৃষ্টিমত্তা সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথার উত্থাপন করেন তবে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। অন্তত, আমার মধ্যে কৃষ্টি আছে এ কথার প্রতিবাদ করাকে আমি আত্মলাঘব মনে করব না।

ইংরেজি ভাষায় চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দে চলে গেছে

ব'লে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব? ইংরেজিতে সুশিক্ষিত মানুষকে বলে কাল্‌টিভেটেড্‌—আমরা কি সেইরকম উঁচুদরের মানুষকে চাষ করা মানুষ ব'লে সম্মান জানাব, অথবা বলব কেদারনাথ।

—(পত্রাংশ—৮ ডিসেম্বর, ১৯৩২)

গত জ্যৈষ্ঠের (১৩৪২) 'প্রবাসীতে' একস্থানে ইংরেজি "কাল্‌চার" শব্দের প্রতিশব্দরূপে "কৃষ্টি" শব্দের ব্যবহার দেখে মনে খট্‌কা লাগল। বাংলা খবরের কাগজে একদিন হঠাৎ-ব্রণের মতো ঐ শব্দটা চোখে পড়ল, তারপরে দেখলুম ওটা বেড়েই চলেছে। সংক্রামকতা খবরের কাগজের বস্তি ছাড়িয়ে উপর মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে দেখে ভয় হয়। "প্রবাসী" পত্রে ইংরেজি অভিধানের এই "অবদানটি" সংস্কৃত ভাষার মুখোষ প'রে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ অনবধানতাবশত। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে "অবদান" শব্দটির যে-প্রয়োগ দেখতে দেখতে ব্যাপ্ত হোলো সংস্কৃত শব্দকোষে তা খুঁজে পাইনি।

"কৃষ্টি" কথাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাংলা ভাষার পায়ে বিঁধেছে। চিকিৎসা করা যদি সম্ভব না হয় অন্তত বেদনা জানাতে হবে। ঐ শব্দটা ইংরেজি শব্দের পায়ের মাপে বানানো। এতটা প্রণতি ভালো লাগে না।

ভাষায় কখনো কখনো দৈবক্রমে একই শব্দের দ্বারা দুই বিভিন্ন জাতীয় অর্থজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, ইংরেজিতে

'কাল্‌চার্‌' কথাটা সেই শ্রেণীর। কিন্তু অনুবাদের সময়েও যদি অনুরূপ কৃপণতা করি তবে সেটা নিতান্তই অনুকরণ-প্রবণতার পরিচায়ক।

সংস্কৃত ভাষায় কর্ষণ বলতে বিশেষভাবে চাষ করা-ই বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে মূল ধাতুটাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক করা যেতে পারে, সংস্কৃত ভাষার নিয়মই তাই। উপসর্গভেদে এক 'কৃ' ধাতুর নানা অর্থ হয়, যেমন উপকার, বিকার আকার। কিন্তু উপসর্গ না দিয়ে কৃতি শব্দকে আকৃতি প্রকৃতি বা বিকৃতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। উৎ বা প্র উপসর্গযোগে কৃষ্টি শব্দকে মাটির থেকে মনের দিকে তুলে নেওয়া যায়, যেমন উৎকৃষ্টি, প্রকৃষ্টি। ইংরেজি ভাষার কাছে আমরা এমনি কী দাসখৎ লিখে দিয়েছি যে তার অবিকল অনুবর্তন ক'রে ভৌতিক ও মানসিক দুই অসবর্ণ অর্থকে একই শব্দের পরিণয়-গ্রন্থিতে আবদ্ধ করব?

বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তাতে শিল্পসম্বন্ধেও সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। "আত্ম-সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।" এ'কে ইংরেজি করা যেতে পারে, Arts indeed are the culture of soul। "ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"—এই সকল শিল্পের দ্বারা যজমান আত্মার সংস্কৃতি সাধন করেন। সংস্কৃত ভাষা বলতে বোঝায় যে-ভাষা বিশেষভাবে cultured, যে-ভাষা cultured সম্প্রদায়ের। মরাঠি হিন্দি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটাই কাল্‌চার অর্থে

স্বীকৃত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাস (cultural history) কৈ্রষ্টিক ইতিহাসের চেয়ে শোনায় ভালো। সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি cultured mind, cultured intelligence অর্থে কৃষ্টচিত্ত কৃষ্টবুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ সন্দেহ নেই। যে মানুষ cultured তাকে কৃষ্টিমান বলার চেয়ে সংস্কৃতিমান বললে তার প্রতি সম্মান করা হবে।

—(কাল্‌চার—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪২)

ভাষার খেয়াল

ভাষা যে সব সময়ে যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিম্বা যোগ্যতম শব্দকে বাঁচিয়ে রাখে তার প্রমাণ পাই নে। ভাষায় চলিত একটা শব্দ মনে পড়ছে "জিজ্ঞাসা করা"। এ রকম বিশেষ্য-জোড়া ওজনে-ভারী ক্রিয়াপদে ভাষার অপটুত্ব জানায়। প্রশ্ন করা ব্যাপারটা আপামর সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য অথচ ওটা প্রকাশ করবার কোনো সহজ ধাতুপদ বাংলায় দুর্লভ এ কথা মান্‌তে সঙ্কোচ লাগে। বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপকে ক্রিয়ার রূপে বানিয়ে তোলা বাংলায় নেই যে তা নয়। তার উদাহরণ যথা,—

ঠ্যাঙানো, কিলোনো, ঘুষোনো, গুঁতোনো, চড়ানো, লাথানো, জুতোনো। এগুলো মারাত্মক শব্দ সন্দেহ নেই, এর থেকে দেখা যাচ্চে যথেষ্ট উত্তেজিত হোলে বাংলায় "আনো" প্রত্যয় সময়ে সময়ে এই পথে আপন কর্ত্তব্য স্মরণ করে। অপেক্ষাকৃত নিরীহ শব্দও আছে, যেমন আগল থেকে আগ্‌লানো; ফল থেকে ফলানো, হাত থেকে হাতানো, চমক থেকে চম্‌কানো। বিশেষণ শব্দ থেকে, যেমন উল্‌টা থেকে উল্‌টানো, খোঁড়া থেকে খোঁড়ানো, বাঁকা থেকে বাঁকানো, রাঙা থেকে রাঙানো।

বিদ্যাপতির পদে আছে, "সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।" যদি তার বদলে—"কি জিজ্ঞাসা করই অনুভব মোয়" ব্যবহারটাই "বাধ্যতামূলক" হোত কবি তাহোলে ওর উল্লেখই বন্ধ করে দিতেন। † অথচ প্রশ্ন করা অর্থে সুধানো শব্দটা শুধু যে কবিতায় দেখি তা নয় অনেক জায়গায় গ্রামের লোকের মুখেও ঐ কথার চল আছে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের আমি সুধাই, জিজ্ঞাসা করা শব্দটি বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বা লোক-সাহিত্যে তাঁরা কোথাও পেয়েছেন কি না।

† "বাধ্যতামূলক" নামে যে একটা বর্ব্বর শব্দ বাংলাভাষাকে অধিকার করতে উদ্যত, তার সম্বন্ধে কি সাবধান হওয়া উচিত হয় না? কম্পলসরি এডুকেশনে বাধ্যতা ব'লে বালাই যদি কোথাও থাকে সে তার মূলে নয় সে তার পিঠের দিকে বা কাঁধের উপর, অর্থাৎ ঐ এডুকেশনটা বাধ্যতাগ্রস্ত বা বাধ্যতাচালিত। যদি বল্‌তে হয় "পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা কম্পলসরি নয়" তাহোলে কি বলা চলবে "পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা বাধ্যতামূলক নয়?" সৌভাগ্যক্রমে "আবশ্যিক" শব্দটা উক্ত অর্থে কোথাও কোথাও চলতে আরম্ভ করেছে।

ভাবপ্রকাশের কাজে শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কাব্যের বোধশক্তি গদ্যের চেয়ে সূক্ষ্মতর এ কথা মানতে হবে। লক্ষিয়া, সন্ধিয়া, বন্দিনু, স্পর্শিল, হর্ষিল শব্দগুলো বাংলা কবিতায় অসংকোচে চালানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে এমন নালিশ চলবে না যে ওগুলো কৃত্রিম, যেহেতু চল্‌তি ভাষায় ওদের ব্যবহার নেই। আসল কথা, ওদের ব্যবহার থাকাই উচিত ছিল; বাংলা কাব্যের মুখ দিয়ে বাংলা ভাষা এই ত্রুটি কবুল করেছে। ("কব্‌লেছে" প্রয়োগ বাংলায় চলে কিন্তু অনভ্যস্ত কলমে বেধে গেল!) "দর্শন লাগি ক্ষুধিল আমার আঁখি" বা "তিয়াষিল মোর প্রাণ"—কাব্যে শুন্‌লে রসজ্ঞ পাঠক বাহবা দিতে পারে, কেন না ক্ষুধাতৃষ্ণাবাচক ক্রিয়াপদ বাংলায় থাকা অত্যন্তই উচিত ছিল, তারই অভাব মোচনের সুখ পাওয়া গেল। কিন্তু গদ্য ব্যবহারে যদি বলি "যতই বেলা যাচ্চে ততই ক্ষুধোচ্চি অথবা তেষ্টাচ্চি" তাহোলে শ্রোতা কোনো অনিষ্ট যদি না করে অন্তত এটাকে প্রশংসনীয় বলবে না।

বিশেষ্য-জোড়া ক্রিয়াপদের জোড় মিলিয়ে এক করার কাজে মাইকেল ছিলেন দুঃসাহসিক। কবির অধিকারকে তিনি প্রশস্ত রেখেছেন, ভাষার সঙ্কীর্ণ দেউড়ির পাহারা তিনি কেয়ার করেন নি। এ নিয়ে তখনকার ব্যঙ্গরসিকেরা বিস্তর হেসেছিল। কিন্তু ঠেলা মেরে দরজা তিনি অনেকখানি ফাঁক ক'রে দিয়েছেন। "অপেক্ষা করিতেছে" না ব'লে "অপেক্ষিছে", "প্রকাশ করিলাম" না ব'লে "প্রকাশিলাম" বা "উদ্‌ঘাটন করিল"-র জায়গায়

"উদ্‌ঘাটিল" বল্‌তে কোনো কবি আজ প্রমাদ গণে না। কিন্তু গদ্যটা যেহেতু চল্‌তি কথার বাহন ওর ডিমক্রাটিক বেড়া অল্প একটু ফাঁক করাও কঠিন। "ত্রাস" শব্দটাকে "ত্রাসিল" ক্রিয়ার রূপ দিতে কোনো কবির দ্বিধা নেই কিন্তু 'ভয়' শব্দটাকে "ভয়িল" করতে ভয় পায় না এমন কবি আজও দেখি নি। তার কারণ ত্রাস শব্দটা চল্‌তি ভাষার সামগ্রী নয়, এই জন্যে ওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামাজিকতা ডিমক্রাসিও খাতির করে। কিন্তু "ভয়" কথাটা সংস্কৃত হোলেও প্রাকৃত বাংলা ওকে দখল ক'রে বসেছে। এই জন্যে ভয় সম্বন্ধে যে প্রত্যয়টার ব্যবহার বাংলায় নেই তার দরজা বন্ধ। কোন্ এক সময়ে "জিতিল" "হাঁকিল" "বাঁকিল" শব্দ চলে গেছে, "ভয়িল" চলেনি— এ ছাড়া আর কোনো কৈফিয়ৎ নেই।

বাংলা ভাষা একান্ত আচারনিষ্ঠ। সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষায় প্রত্যয়গুলিতে নিয়মই প্রধান, ব্যতিক্রম অল্প। বাংলা ভাষার প্রত্যয়ে আচারই প্রধান, নিয়ম ক্ষীণ। ইংরেজিতে "ঘামছি" বল্‌তে am perspiring ব'লে থাকি, "লিখ্‌ছি" বল্‌তে am penning বলা দোষের হয় না। বাংলায় ঘামছি বল্‌লে লোকে কর্ণপাত করে কিন্তু কলমাচ্চি বল্‌লে সইতে পারে না। প্রত্যয়ের দোহাই পাড়লে আচারের দোহাই পাড়বে। এই কারণেই নূতন ক্রিয়াপদ বাংলায় বানানো দুঃসাধ্য, ইংরেজিতে সহজ। ঐ ভাষায় টেলিফোন কথাটার নূতন আমদানি, তবু হাতে হাতে ওটাকে ক্রিয়াপদে ফলিয়ে তুল্‌তে কোনো মুস্কিল ঘটে নি। ডানপিটে

বাঙালি ছেলের মুখ দিয়েও বের হবে না, "টেলিফোনিয়েছি" বা "সাইক্লিয়েছি"। বাংলা গদ্যের অটুট শাসন কালক্রমে কিছু কিছু হয়তো বা বেড়ি আল্‌গা ক'রে আচার ডিঙোতে দেবে। বাংলায় কাব্য-সাহিত্যই পুরাতন, এই জন্যেই প্রকাশের তাগিদে কবিতায় ভাষার পথ অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে। গদ্য-সাহিত্য নূতন, এই জন্যে শব্দসৃষ্টির কাজে তার আড়ষ্টতা যায় নি। তবু ক্রমশ তার নমনীয়তা বাড়বে আশা করি। এমন কি, আজই যদি কোনো তরুণ লেখক লেখেন, "মাইকেল বাংলা-সাহিত্যে নূতন সম্পদের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিলেন" তা নিয়ে প্রবীণরা খুব বেশি উত্তেজিত না হোতে পারেন। ভাবীকালে আধুনিকেরা কতদূর পর্য্যন্ত স্পর্দ্ধিয়ে উঠবেন বল্‌তে পারি নে কিন্তু অন্তত এখনি তাঁরা "জিজ্ঞাসা করিলেন"-এর জায়গায় যদি জিজ্ঞাসিলেন" চালিয়ে দেন তাহোলে বাংলা ভাষা কৃতজ্ঞ হবে।

"লজ্জা করবার কারণ নেই" এটা আমরা লিখে থাকি। "লজ্জাবার কারণ নেই" লেখাটা নির্লজ্জতা। এমন স্থলে ঐ জোড়া ক্রিয়াপদটা বর্জ্জন করাই শ্রেয় মনে করি। লিখ্‌লেই হয় "লজ্জার কারণ নেই"। "প্রুফ সংশোধন করবার বেলায়" কথাটা সংশোধনীয়, বলা ভালো "সংশোধনের বেলায়"। সহজ ব'লেই গদ্যে আমরা পূরো মন দিইনে, বাহুল্য শব্দ বিনা বাধায় যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ে। আমার রচনায় তার ব্যতিক্রম আছে এমন অহঙ্কার আমার পক্ষে অত্যুক্তি হবে।

ভাষার খেয়াল সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত আমার প্রায় মনে পড়ে।

ভালো বিশেষণ ও বাসা ক্রিয়াপদ জুড়ে' ভালোবাসা শব্দটার উৎপত্তি। কিন্তু ও-দুটো শব্দ একটা অখণ্ড ক্রিয়াপদ রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্ব্বকালে ঐ "বাসা" শব্দটা হৃদয়াবেগসূচক বিশেষ্যপদকে ক্রিয়াপদে মিলিয়ে নিত। যেমন ভয় বাসা, লাজ বাসা। এখন হওয়া করা পাওয়া ক্রিয়াপদ জুড়ে' ঐ কাজ চালাই। "বাসা" শব্দটা একমাত্র হৃদয়বোধসূচক; হওয়া, পাওয়া করা তা নয়। এই কারণে 'বাসা' কথাটা যদি ছুটি না নিয়ে আপন পূর্ব্ব কাজে বহাল থাকত তাহোলে ভাবপ্রকাশে জোর লাগাত। "এ কথায় তার মন ধিক্কার বাস্‌ল" প্রয়োগটা আমার মতে "ধিক্কার পেল"র চেয়ে জোরালো।

—(প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪২)

পরিশিষ্ট

শব্দ-চয়ন*

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখ্‌তে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধ'রে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষ্যে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হোলো। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন 'সহানুভূতি'। এটা sympathy শব্দের তর্জ্জমা। 'সিম্প্যাথি'-র গোড়াকার অর্থ ছিল 'দরদ'। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারকালে ইংরেজিতে 'সিম্প্যাথি'-র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা বলতে আরম্ভ করেছি—'এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে'। বলা উচিত, 'সম্মতি আছে', বা 'আমি এর সমর্থন করি'।

---

* সন ১৩৩৬, ২৫শে মাঘ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

যা-ই হোক্—সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়—যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাথেটিক্'-এর কী তর্জ্জমা হোতে পারে, 'সহানুভৌতিক', বা 'সহানুভূতিশীল'. বা 'সহানুভূতিমান্'? ভাষায় যেন খাপ খায় না—সেই জন্যেই আজ পর্য্যন্ত বাঙালি লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা 'দরদী' ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক'রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্চে 'অনুকম্পা'। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়—যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হোলে সেই তারটী অনুকম্পিত ও অনুধ্বনিত হয়। এই তো 'অনুকম্পন'। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই তো ঠিক 'অনুকম্পা'। 'অনুকম্পায়ী' কথাটা সংস্কৃতে আছে। 'অনুকম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। 'অনুকম্পালু' বোধ করি ভালোই চলে। মুস্কিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'কান, সোনা, চুন, পান' শব্দগুলোতে মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েছে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে, কানের এক "সোনায়" যদি মূর্দ্ধন্য ণ লাগ্‌ল, তবে অন্য "শোনায়" কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের র-ফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে

তার মূর্দ্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েছে। অথচ 'স্বর্ণ' শব্দ যখন রেফ বর্জ্জন ক'রে 'সোনা' হোলো, তখন মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত পোড়োরা 'সোনাকে শোধন ক'রে নিয়েছিন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা—এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধানকর্ত্তা ছিলেন—সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্দ্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয়নি। কৃষ্ণ শব্দজাত কানাই শব্দে আজও দন্ত্যন চলছে, বর্ণ (বর্ণ যোজন) শব্দজাত বানান শব্দে আজও মূর্দ্ধণ্য ণ-এর প্রবেশ ঘটেনি তাতে কি পাণ্ডিত্যের খর্ব্বতা ঘটেছে?

কিছু কাল পূর্ব্বে যখন ভারতশাসনকর্ত্তারা 'ইণ্টার্ন্' সুরু করলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল—'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হোতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। Externmentকে কি বল্‌তে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্য্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। প্রথমতঃ শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই

হচ্চে শিক্ষার মূলে—তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্‌শন্‌'। অথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিষটা কী। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত'—কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। 'কম্পাল্‌সারি এডুকেশন'-এর বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'কম্পাল্‌সারি সাবজেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্য-পাঠ্য বিষয়', কি সঙ্গত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি বিপরীতে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজিতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনোটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'—আর ভাবনা রইল না। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'—যেমন ক'রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি—'ওভারপপ্যুলেশন'—বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে

গেলে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয় ;—সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেণ্ট', 'নন্‌রেসিডেণ্ট' বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেবো কী? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় 'আবাসিক', 'অনাবাসিক'। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে আমি কিছুদিন সন্ধানের কাজ করেছিলাম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্ততঃ এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগ্‌বে ব'লে আমার বিশ্বাস।

অকর্ম্মান্বিত—unemployed

অক্ষিভিষক্‌—oculist

অঘটমান—incongruous, incoherent

অঙ্কূয়ৎ—moving tortuously—অঙ্কূয়ন্তী নদী

অঙ্গারিত—charred

অতিকথিত, অতিকৃত—exaggerated

অতিজীবন—survival

অতিদিষ্ট—overruled

অতিনেমিষ চক্ষু—staring eyes

অতিপরোক্ষ—far out of sight

অতিপ্রজন—over-population

অতিভৃত—well filled

অতিষ্ঠা—precedence

অতিষ্ঠাবান্—superior in standing

অতিসর্গ—act of parting with

অতিসর্গ দান করা—to bid any one farewell

অতিসর্পণ—to glide or creep over.

অতিসারিত—made to pass through

অতিস্রুত— that which has been flowing over

অত্যন্তগত—completely pertinent, always applicable

অত্যন্তীন—going far

অত্যূর্ম্মি—bubbling over

অর্থপদবী—path of advantage

অধঃখাত—undermined

অধিকর্ম্মা—superintendent

অধিজানু—on the knees

অধিবক্তা—advocate

অধিষ্ঠায়কবর্গ—governing body

অনপক্ষেপ্য—not to pe rejected

অনপেক্ষিত—unexpected

অনাত্ম্য—impersonal

অনার্ত্তব—unseasonabl:

অনাপ্ত—unattained

অনাপ্য—unattainable

অনাবাসিক—non-residen:

অনাবেদিত—not notified

অনায়ক—having no leader

অনায়তন—groundless

অনায়ুষ্য—fatal to long life

অনারত—without interruption

অনালম্ব—unsupported

অনাস্থান—having no basis or fulcrum

অনিকামতঃ—involuntarily

অনিজক—not one's own

অনিন—feeble, inane

অনির্বিদ—undesponding

অনিভৃত—not private, public

অনিষ্ঠা—unsteadiness

অনীহা—apathy

অনুকম্পায়ী—condoling

অনুকল্প—alternative

অনুকাঙ্ক্ষা—longing

অনুকাল—opportune

অনুকীর্ণ—crammed

অনুকীর্তন—proclaiming, publishing

অনুক্রকচ—serrated,

অনুগামুক—habitually *following*

অনুজ্ঞা—permission

অনুজ্ঞাত—allowed

অনুত্তুন্ন—muffled (sound)

অনুদত্ত—remitted

অনুদেশ—reference to something prior

অনুপর্ব্বত—promontory

অনুপার্শ্ব—lateral

অনুযাত্র—retinue

অনুরথ্যা—side-road

অনুলাপ—repetition

অনুষঙ্গ—association

অন্তশ্ছেদ—intercept

অন্তর্জাত—inborn

অন্তঃপাতিত—inserted

অন্তর্ভৌম—subterranean

অন্তম—intimate

অন্তয্য—interior

অন্তরায়ণ—internment

অন্তরীয়—under-garment

অপক্ষেপ—reject

অপচেতা—spendthrift

অপণ্য—not for sale, unsalable

অপপাঠ—worng reading
অপম—the most distant
অপলিখন—to scrape off
অপশব্দ—vulgar speech
অপহাস—a mocking laugh
অপাটব—awkwardness
অপ্রতিষ্ঠ—unstable
অপ্রভ—obscure
অপ্সুদীক্ষা—baptism
অবঘোষণা—announcement
অবশ্চ্যুত—trickled down
অবর্জ্জনীয়—inevitable
অবধূলন—scattering over
অবমতি—contempt
অবমন্তব্য—contemptible
অবরপুরুষ—descendant
অবরার্দ্ধ—the least part
অবস্থাপন—exposing goods for sale
অবিতর্কিত—unforeseen
অবুদ্ধিপূর্ব্ব—not preceded by intelligence
অবেক্ষা—observation
অভয়দক্ষিণা—promise of protection from danger

অভয়পত্র—a safe conduct
অভিজ্ঞানপত্র—certificate
অভিসমবায়—association
অভ্যাঘাত—interruption
অর্ম—ruins, rubbish
অরত—apathetic
অল্পোন—slightily deficient
অশ্রি—angle, sharp side of anything
অসংপ্রতি—not according to the moment
অস্তব্যস্ত—scattered, confused
আকরিক, আখনিক—miner
আকল্প—design
আকৃত—shaped
আগামিক—incoming
(নির্গামিক—outgoing)
আঙ্গিক—technique—আঙ্গিক ভাব
আচয়—collection
আচিত—collected
আত্মকীয়
আত্মনীয় } —one's own, original
আত্মনীন
আত্মতা—essencc
আত্মবিবৃদ্ধি—self-aggrandisement

আত্যয়িক—urgent

আনৈপুণ্য—clumsiness

আপত্তিক—accidental

আপাতমাত্র—being only momentary

আবাসিক—resident

(নির্বাসিক—non-resident)

উক্তপ্রত্যুক্ত—discourse

উচ্চয় অপচয়—rise and fall

উচ্চণ্ড—very passionate

উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি—elevation

উচ্ছিষ্টকল্পনা—stale invention

উদ্‌গর্জ্জিত—bursting out, roaring

উদ্‌ঘোষ—loud-sounding

উত্তত—stretching oneself upwards

উত্তভিত—upheld, uplifted

উদ্ধর্ষ—courage to undertake anything

উদ্যোগসমর্থ—capable of exertion

উৎপারণ—to transport over

উদ্বাসিত—deported

উন্মিতি—measure of altitude

উপস্কর—apparatus

উন্মুখর—loud-sounding

উন্মুদ্র—unsealed
উন্মৃষ্ট—rubbed off
উপজ্ঞা—untaught or primitive knowledge
উপধূপন—fumigation
উপনদ্ধ—inlaid
উপনিপাত—national calamities
উপপাত—accident
উপপুর—suburb
উল্বণ নাদ—shrill sound
ঊনতা—deficiency
ঊর্মিমান, ঊর্মিল—undulating
একতৎপর—solely intent on
একায়ন—footpath
ঐকাঙ্গ—bodyguard
ঐকাত্ম্য—identity
ঐচ্ছিক—optional
ঐতিহ্য— tradition, traditional
কণাকার—granular
কম্র—loving, beautiful
কম্বুরেখা— spiral
করণতা—instrumentality
কাব্যগোষ্ঠী—a conversation on poetry

কাম্যব্রত—voluntary vow (with special aim)

কারু, কারুক—artisan

কালকরণ—appointing time

কালসম্পন্ন—bearing a date

কালাতিক্রমণ—lapse of time

কালান্তর—intermediate time

কির্ব্বির
কির্ম্মীর
কির্ম্মীরিত } variegated colour

কুটিল রেখা—curved line

কুলব্রত—family tradition

কুশলতা—cleverness

কূণিত—contracted

কৃতাভ্যাস—trained

কৃশিত—emaciated

কেলিসচিব—minister of the sports

কেবলকর্ম্মী—performing mere works without intelligence

ক্রমভঙ্গ—interruption of order

ক্রয়লেখ্য—deed of sale

ক্ষয়িষ্ণু—perishable

ক্ষিপ্রনিশ্চয়—one who decides quickly

গর্গর—whirlpool, eddy

গণক-মহামাত্র—finance minister

গীতক্রম—arrangement of a song

গুম্ফন—grouping

গৃহব্রত—devoted to home

গেহেশূর—carpet-knight

গোত্রপট—genealogical table

গোপ্রতার—ox-ford (যেখানে গোরু পার করে);

গ্রন্থকুটী—library

গ্রামকূট—congestion of villages

গ্লান—tired, emaciated

চক্রচর—world-trotter

চটুলালস—desirous of flattery

চরিষ্ণু—movable

জড়াত্মক—inanimate, unintelligent

জড়াত্মা—stupid

জনপ্রিয়—popular

জনসংসদ—assembly of men

জনাচার—popular usage

জরিষ্ণু—decaying

জ্ঞানসন্ততি—continuity of knowledge

তনিকা—string, বীণার তার

তনুবাত—rarified atmosphere

তরঙ্গরেখা—curved line

তন্ত্রী—string, বীণার তার

তরস্বতী
তরস্বিনী
তরস্বী —quick moving

তরস্থান—landing place

তরুণিমা—juvenility

তাৎকালিক—simultaneous

তাৎকাল্য—simultaneousness

তীর্ণপ্রতিজ্ঞ—one who has fulfilled his promise

দিবাতন—diurnal

দুর্গত কর্ম্ম—relief work, employment offered to the famine-stricken.

দুর্ম্মর—dying hard (die-hard)

দুরভিসম্ভব—difficult to be performed

দৃপ্ত—arrogant

দ্রপ্স—a drop

দ্রপ্সী—falling in drops

দ্রব্যত্ব—substance, substantiality

দ্রাংক্ষণ—discordant sound

দ্রাঘিত—lengthened

দ্রোহবুদ্ধি—maliciously minded

দ্বয়বাদী—double-tongued

দ্বারকপাট—leaf of a door

ধূম্রিমা—obscurity

নঙর্থক—negative

নভস—misty, vapoury

নাব্য—navigable

নিমিশ্ল—attached to

নির্গামিক—outgoing

নির্নিক্ত—polished

নির্বাসিক—non-resident

নিষ্কাসিত—expelled

নীরক্ত—colourless, faded

পণ্যসিদ্ধি—prosperity in trade

পতিম্বরা—a woman who chooses her husband

পর্ণশিরা—vein of a leaf

পর্য্যায়চ্যুত—superceded, supplanted

পরাচিত—nourished by another, parasite

পরিলিখন—outline or sketch

পরিস্রাবণ—filtering

পরুত্তন—belonging to the last year

পাদাবর্ত্ত—a wheel worked by feet for raising of water

পারণীয়—capable of being completed

পিচ্চট—pressed flat, চ্যাপ্টা

পুটক—pocket

পুনর্ব্বাদ—tautology

পুরস্ত্রী—matron

পূর্ব্বরঙ্গ—prelude or prologue of a drama

পৃচ্ছনা }
পৃচ্ছা } —spirit of enquiry

পৃথগাত্মা—individual

পৃথগাত্মিকতা—individuality

প্রচয়—collection

প্রচয়ন—collecting

প্রচয়িকা—collection

প্রচিত—collected

প্রণোদন—driving

প্রতিক্রম—reversed or inverted order

প্রতিচারিত—circulated

প্রতিজ্ঞাপত্র—promissory note

প্রতিপণ—barter

প্রতিপ্রতি—a counterpart

প্রতিবাচিক—answer

প্রতিভা—কারয়িত্রী—genius for action

প্রতিভা—ভাবয়িত্রী—genius for ideas, or imagination

প্রতিমান—a model, pattern

প্রতিলিপি—a copy, transcript

প্রতীপগমন—retrograde movement

প্রত্যক্ষবাদী—one who admits of no other evidence than perception by the senses

প্রত্যক্ষসিদ্ধ—determined by the evidence of the senses

প্রত্যভিজ্ঞা } —recognition
প্রত্যভিজ্ঞান }

প্রত্যভিনন্দন } —returning a salutation
প্রত্যর্চন }

প্রত্যরণ্য—near or in a forest

প্রত্যুজ্জীবন—returning to life

প্রথম কল্প—a primary rule

প্রপাঠ—chapter of a book

প্রবাচন—proclamation

প্রলীন—dissolved

প্রসাধিত—ornamented

প্রাগ্রসর—foremost, progressive

প্রাণবৃত্তি—vital function

প্রাণাহ—cement used in building

প্রাতস্তন—matutinal

প্রাতিভজ্ঞান—intuitive knowledge

প্রেক্ষার্থ—for show

প্রেক্ষণিকা—exhibition

প্রোল্লোল—moving to and fro

প্রৌঢ় যৌবন—prime of youth

বর্ত্তিষ্ণু—stationary

বস্তুমাত্রা—mere outline of any subject

বাগ্‌জীবন—buffoon

বাগ্‌ড়ম্বর—grandiloquence

বাতপ্রাবর্ত্তিম—irrigation by wind-power

বাগ্‌ভাবক—promoting speech, with a taste for words

বিচিতি—collection

বিষয়ীকৃত—realised

বৃত—elected

বশঙ্গম—influenced

ভঙ্গীবিকার—distortion of features

ভবিষ্ণু—progressing

ভিন্নক্রম—out of order

ভূমিকা—বাড়ীর তলা, যথা চতুর্ভূমিক—four-storied

ভেষজালয়—dispensary

ভ্রাতৃব্য—cousin

মণ্ডপ কবি—a poet for the crowd

মনোহত—disappointed

মায়াত্মক—illusory

মুদ্রালিপি—lithograph

মুমূর্ষা—desire of death

মৃদুজাতীয়—somewhat soft, weak

মৌল—aboriginal

যথাকথিত—as already mentioned

যথাচিন্তিত—as previously considered

যথাতথ—accurate

যথানুপূর্ব্ব—according to a regular series

যথাপ্রবেশ—according as each one entered
(সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে)

যথাবিত্ত—according to one's means

যথামাত্র—according to a particular measure

যন্ত্রকর্ম্মকার—machinist

যন্ত্রগৃহ—manufactory

যন্ত্রপেষণী—grinding mill, জাঁতা

যমল গান—duet song

রলরোল—wailing

রোচিষ্ণু—elegant

লঘুখট্বিকা—easy chair

লোককান্ত—popular

লোকগাথা—folk-verses

লোকবিরুদ্ধ—opposed to public opinion

শক্তিকুণ্ঠন—deadening of a faculty

শঙ্কাশীল—diffident,hesitating

শয়নবাস—sleeping garment

শিঞ্জা, শিঞ্জান—tinkling sound

শিথির—flexible, pliant

শিথির—loose

শিল্পজীবী—artisan

শিল্পবিধি—rules of art

শিল্পালয়—art institute

শ্মীল—winking, blinking

শ্লক্ষ্ণ—slippery, polished

শ্লথোদ্যম—relaxed effort

সংকেতমিলিত—met by appointment

সংকেতস্থান—place of assignation

সংক্রমণকা—a gallery

সংরাগ—vehemence

সংলাপ—conversation

সৎকলা—a fine art

সত্যস্ক }
সত্যস্তন } —belonging to the present day

সময়চ্যুতি—neglect of the right time

সমাহর্ত্তা—collector-general

সমূহকার্য্য—business of a community

সম্প্রতিবিদ্—knowing only the present, not what is beyond

সহজপ্রণেয়—easily led

সহধুরী—colleague

সাত্ত্বিক ভাবক—promoting the quality of purity,

সাংকথ্য—conversation

সীতাধ্যক্ষ—the head of the agricultural department

সীমাসন্ধি—meeting of two boundaries

স্রস্ত—slipped

স্রপ্র—lithesome, supple

সুশ্লক্ষ্ণ—delicate

সৌচিক—tailor

স্ত্রীদ্বেষী—misogynist

স্ত্রীময়—effiminate

স্ফায়িত—expanding

স্ফির—tremulous

স্বগোচর—on'e own range or sphere

স্বচর—self-moving

স্বপ্রভুতা—arbitrary power

স্ববহিত—self-impelled

স্ববিধি—one's own rule or method

স্বমনীষা—own judgment or opinion

স্বয়ম্বশ—independent

স্বয়ম্বহ—self-moving

স্বয়ম্ভূত
—self-supporting
স্বয়ম্ভর

স্বয়মুক্তি—voluntary testimony

স্বসংবেদ্য—intelligible to one's self

স্বসিদ্ধ—spontaneously effected

স্বাবমাননা—self-contempt

স্বৈরবর্ত্তী—following one's own inclination

স্রস্তর, স্রস্তরা—couch, sofa

স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিম—water-power motion irrigation

হস্তপ্রাবর্ত্তিম—hand-power motion irrigation

হৃদয়ভাবক—promoting the feelings and sensations moved by sentiments

নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি নানাসময়ে নানা লোকের পত্রোত্তরে রচিত হইয়াছে :—

অবমানব—Sub-man

একক সঙ্গীত—Solo

জাত—Caste

জাতি, প্রবংশ—Race

পরশ্রমজীবী বা পরশ্রমভোগী—Bourgeois

পরার্থশ্রমী—Proletariat

পুরাজৈবিক—Proterozoic

প্রজন—Population

প্রাকপ্রস্তর—Eolith

প্রাক্‌মানব—Evanthropus

প্রাগাধুনিক—Eocene

যুগ্মক সঙ্গীত—Duet

রাষ্ট্রজাতি—Nation

রীতি ও পদ্ধতি—Cult and Dogma

শিলক—Fossil

শিলীকৃত—Fossilized

সম্মেলক সঙ্গীত—Chorus.